ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কালজয়ী বিপ্লব

১ম খণ্ড

মূল : আয়াতুল্লাহ শহীদ মুর্তাজা মোতাহারী

সংকলনে: আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শিরোনামঃ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কালজয়ী বিপ্লব

মূলঃ শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী

সংকলেনঃ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

তত্ত্বাবধানঃ মোহাম্মদ আওরায়ী কারিমী

কালচারাল কাউন্সেলর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস - ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশনাঃ কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস - ঢাকা প্রকাশকাল : দ্বিতীয় মুদ্রণ (সংযোজিত অংশসহ), ডিসেম্বরর ০৮, মহররম ১৪৩১হিঃ, পৌষ ১৪১৬ বঃ

সংখ্যা : ২০০০

Title: Imam Hossain (A.) Er Kaljoie Biplob

Writer: Ayatullah Shahid Murtaza Motahhari

Translator: Abdul Quddus Badsha

Supervisor: Mohammad Oraei Karimi

Cultural Counsellor

Embassy of the I.R.of Iran-Dhaka

Publication Date: 2nd Edition (with addition),

December 2008

Circulation: 2000

ভূমিকা

বিসিমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শহীদদের নেতা হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) বলেন, ‘‘যদি মুহাম্মাদ (সা) এর ধর্ম আমার নিহত হওয়া ছাড়া টিকে না থাকে তাহলে, এসো হে তরবারী! নাও আমাকে।’’ নিঃসন্দেহে কারবালার মর্ম বিদারী ঘটনা হলো মানব ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় ঘটে যাওয়া অজস্র ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয়। এটা এমন এক বিস্ময়কর ঘটনা, যার সামনে বিশ্বের মহান চিন্তাবিদরা থমকে দাড়াতে বাধ্য হয়েছেন, পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে স্তুতি- বন্দনায় মুখিরত হয়েছেন এই নজিরবিহীন আত্মত্যাগের। কারণ, কারবালার কালজয়ী বিপ্লবের মহানায়করা ‘‘অপমান আমাদের সয়না”- এই স্লোগান ধ্বনিত করে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংখ্যায় হাতে গোনা জনাকয়েকটি হওয়া সত্ত্বেও খোদায়ী প্রেম ও শৌর্যে পূর্ণ টগবেগ অন্তর নিয়ে জিহাদ ও শাহাদাতের ময়দানে আবির্ভূত হন এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার অধঃজগতকে পেছনে ফেলে উর্দ্ধজগতে মহান আল্লাহর সনে পাড়ি জমান। তারা স্বীয় কথা ও কাজের দ্বারা জগতবাসীকে জানিয়ে দিয়ে যান যে, ‘‘যে মৃত্যু সত্যের পথে হয়, তা মধূর চেয়েও ধাময়।’’

বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের জীবনপটে যেমন, তেমনি তাদের পবি বিশ্বাসের পাদমূলে আ রার স ীবনী ধারা বাহমান। কারবালার আন্দোলন দীর্ঘ চৌদ্দশ’ বছর ধরে- গভীর বারিধারা দ্বারা তৃ া নিবারণ করে এসেছে প্রাণসমূহের। আজও অবধি মূল্যবোধ, আবেগ, অ ভূতি, বিচক্ষণতা ও অভিপ্রায়ের অযুত- অজস্র ক্ষ্ম ও স্থুল বলয় বিদ্যমান যা এই আ রার অক্ষকে ঘিরে আবর্তনশীল। প্রেমের বৃত্ত অঙ্কনের কাটা- কম্পাস স্বরূপ হলো এ আ রা।

নিঃসন্দেহে এই কালজয়ী বিপ্লবের অন্তঃস্থ মর্মকথা এবং এর চেতনা, লক্ষ্য ও শিক্ষা একটি সমৃদ্ধশালী, নিখাদ ও প্রেরণাদায়ক সংস্কৃতি গঠন করে। প্রকৃত ইসলামের বিস্তৃত অঙ্গনে এবং আহলে বাইেতর হৃদ ভক্তকুল, ছোট- বড়, জ্ঞানী- মূর্খ নির্বিশেষে সর্বদা এই আ রা সংস্কৃতির

সাথেই জীবন যাপন করেছে, বিকিশত হয়েছে এবং এ জন্যে আত্মাহুতি দিয়েছে। এই সংস্কৃতির চর্চা তাদের জীবনে এত দূর প্রসারিত হয়েছে যে জন্মক্ষণে নবজাতেকর মুখে সাইয়্যেদুশ হাদার তুরবাত (কারাবালার মাটি) ও ফোরাতের পানির আস্বাদ দেয় এবং দাফনের সময় কারবালার মাটি মৃতের সঙ্গে রাখে। আর জন্ম থেকে মৃত্যু অবিধও সারাজীবন হোসাইন ইবনে আলী (আ.) এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি পোষণ করে, ইমামের শাহাদাতের জন্য অশ্রুপাত করে। আর এই পবি মমতা দুধের সাথেই প্রাণে প্রবেশ করে আর প্রাণের সাথেই নিঃসিরত হয়ে যায়।

কারবালার আন্দোলন সম্পর্কে অদ্যাবিধ অসংখ্য রচনা, গবেষণা এবং কাব্য রচিত হয়েছে। ক্ষ্ণ চিন্তা ও ক্ষুরধার কলমের অধিকারী যারা, তারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও নানান দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই কালজয়ী বিপ্লবের বিশ্লেষণ করেছেন। এই সকল রচনাকর্ম যদি এক করা হয় তাহলে তা পরিণত হবে এক মহাগ্রন্থাগারে। কিন্তু তবুও এ সম্পর্কে নব নব গবেষণা ও ভাবনার অঙ্গন এখনো উন্মুক্ত রয়ে গেছে। কবি 'সায়েব' এর ভাষায়ঃ

''এক জীবন ধরে করা যায় (ধু) বন্ধুর কোকড়া চুলের বর্ণনা
এই চিন্তায় যেওনা যে ছন্দ ও স্তবক ঠিক থাকলো কি- না''

বক্ষমান বইখানি মহান দার্শনিক ও রুহানী আলেম আয়াতুল্লাহ শহীদ মুর্তাজা মোতাহারীর এই কালজয়ী বিপ্লব সম্পর্কিত বক্তৃতামালা ও রচনাবলী থেকে নির্বাচিত অংশের বঙ্গা বাদ। ফার্সী ভাষায় 'হেমাসা- এ হোসাইনী' শিরোনামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই থেকে আরো ৬টি কলাম যোগ করে বাংলাভাষায় বর্ধিত কলেবরে দ্বিতীয় বারের মতো প্রকাশিত হলো ''ইমাম হোসাইন (আ.) এর কালজয়ী বিপ্লব''। ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কর্তৃক বইটি প্রকাশ করে বাংলাদেশের আহলে বাইত (আ.) এর প্রতি ভালবাসা পোষণকারী সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হল যাতে তাদের আল্লাহ অভিমুখে পূর্ণযা ার পথে আলোকবর্তিকা হয় ইনশাআল্লাহ।

আশা করা যায়, বইটি পবি আহলে বাইত (আ.) এর ভক্তকূল, যারা অন্তরে ইমাম হোসাইন (আ.) এর প্রেমভক্তি লালন করে এবং তারই সমুন্নত আদর্শের সামনে মাথা নোয়ায়, তাদের জন্য উপকারী হবে।

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস, ঢাকা।

কারবালা ট্রাজেডির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

কীভাবে নবীর (সা.) উম্মতই নবীর (সা.) সন্তানকে হত্যা করলো (!) - এ জিজ্ঞাসা সবযুগের প্রতিটি বিবেকবান মা ষের। আর এ ধরনের প্রশ্ন জাগাটাও খুব স্বাভাবিক। কেননা, ইমাম হোসাইনের (আ.) মর্মান্তিক শাহাদাত এক বিষাদময় ঘটনা কিংবা আল্লাহর পথে চরম আত্মত্যাগের এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্তই ধু নয়, এ ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে বড়ই অদ্ভুত মনে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর তিরোধানের মা ৫০ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই এ হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। আর এ হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা.) উম্মত যারা রাসূল এবং তার বংশকে ভালবাসে বলে ইতোমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছিল। তাও আবার রাসূলের (সা.) সেইসব শত্রুদের পতাকাতলে দাড়িয়ে মুসলমানরা রাসূলের (সা.) সন্তানের উপর এ হত্যাকাণ্ড চালায় যাদের সাথে কি- না রাসূলুল্লাহ (সা.)র তিন- চার বছর আগ পর্যন্ত ও অব্যাহতভাবে যুদ্ধ করে গেছেন!

মক্কা বিজয়ের পর যখন চারদিকে ইসলামের জয়জয়কার তখন ইসলামের ঐ চির শত্রুরাও বাধ্য হয়েই নিজেদের গায়ে ইসলামের একটা লেবেল লাগিয়ে নেয়। তাই বলে ইসলামের সাথে তাদের শত্রুতার কোনো কমিত ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের উক্তিটি প্রযোজ্য । তিনি বলেছিলেন-

استسلموا و لم يسلموا

"তারা মুসলমান হয়নি, ইসলাম গ্রহনের ভান করেছিল মা ।"

আবু ফিয়ান প্রায় ২০ বছর যাবত রাসূলুল্লাহর (সা.) সাথে যুদ্ধ করে। ধু তাই নয়, শেষের দিকে ৫/৬ বছর সে ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং ফেতনা সৃষ্টিতে সরদারের ভূমিকা পালন করে।মোয়াবিয়া তার পিতার কাধে কাধ মিলিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতায় নামে। এভাবে আবু ফিয়ানের দল অর্থাৎ উমাইয়ারা ইসলামের চরমতম শত্রুতে পরিণত হয়। অথচ আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে প্রত্যক্ষ করি যে, রাসূলুল্লাহর (সা.) ওফাতের মা দশবছর পরে সেই মোয়াবিয়া

এসে ইসলামী শাসনযন্ত্রের শীর্ষে আরোহণ করে শাম বা সিরিয়ার গভর্ণর হয়ে বসে। আরও বিশবছর পরে ইসলামের এই শত্রু হয়ে বসলো স্বয়ং মুসলমানদের খলীফা! এখানেই শেষ নয়, রাসূলের (সা.) মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর পর এবার মুসলমানদের খলীফা হল মোয়াবিয়া- পু ইয়াযিদ। আর এই ইয়াযিদ নামায, রোযা, হজ্ব যাকাত তথা ইসলামের বিধি- বিধান পালনকারী মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে অর্ধশতাব্দী গড়াতে না গড়াতেই রাসূলের (সা.) সন্তানকে হত্যা করলো। এসব নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাথা বিগড়ে গেলেও ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। ঐ সব মুসলমানরা যে ইসলামকে পরিত্যাগ করেছিল তা নয়, বরং ইমাম হোসাইনের (আ.) প্রতি তাদের ভক্তির অভাব ছিল তারও কোনো প্রমাণ মেলে না। কারণ, ইমাম হোসাইনের (আ.) প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলে তারা হয়তো বলতে পারতো যে, (নাউযুবিল্লাহ) ইমাম হোসাইন (আ.) ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছেন। তরাং তাকে হত্যা করতে কোনো বাধা নেই। বরং তারা নিশ্চিতভাবে ইয়াযিদের ওপর ইমাম হোসাইনের (আ.) সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় বিশ্বাস করতো। তাহলে এখন প্রশ্ন হল যে, প্রথমতঃ কিভাবে মুসলিম শাসন ক্ষমতা ইসলামের ঘোরশত্রু আবু ফিয়ানের দলের হাতে পড়লো? দ্বিতীয়তঃ যে মুসলমানরা ইমাম হোসাইনের (আ.) রক্তের মূল্য যথার্থভাবে অবগত ছিল তারা কিভাবে ইমাম হোসাইনকে (আ.) হত্যা করলো?

প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় যে, উমাইয়াদের মধ্যে প্রথমভাগে মুসলমান হবার গৌরব অর্জন করেছিল এবং ইসলামের প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করতো না, বরং ইসলামের জন্যে অনেক অবদানই রেখেছিল এমন ব্যক্তির (অর্থাৎ ওসমানের) খলীফা পদ লাভই ছিল এর মূল কারণ। এর ফলেই উমাইয়ারা সর্ব প্রথম মুসলিম খেলাফত লাভ করার যোগ পায়। আর, এ যোগকে ব্যাবহারকরে তারা ইসলামী শাসন ব্যাবস্থাকে নিজেদের মুলুকে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। স্বয়ং মারওয়ানই এর জলন্ত উদাহরণ। অবশ্য হযরত ওমরের শাসনামলেই মোয়াবিয়াকে শাম বা সিরিয়ার গভর্ণর হিসেবে নিযুক্তির মাধ্যমেইসলামী শাসনযন্ত্রে উমাইয়াদের উত্থান ঘটে। পরবর্তিতে অন্য সব গভর্ণরের পদে রদবদল করা হলেও মোয়াবিয়াকে তার পদে বহাল রাখা

হয়। এটাই ছিল মুসলিম শাসন ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার মাধ্যমে উমাইয়াদের হীন বাসনা চরিতার্থ করণের পথে প্রথম অ কূল ইঙ্গিত।

উমাইয়ারা হযরত ওসমানের শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি ছড়ায় ও গোলযোগ সৃষ্টি করে। এতে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং শেষ পর্যন্ত মোয়াবিয়া তার সে লালসা পুরণের জন্য মোক্ষম যোগ পেয়ে গেল। সে নিজের পক্ষ থেকে ওসমানকে 'মজলুম খলীফা', 'শহীদ খলীফা' প্রভৃতি বিধামত স্লোগান দিয়ে প্রচারকার্য রু করলো এবং স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে আদাজল খেয়ে লেগে গেল। সন্দেহযরত ওসমানের রক্তভেজা জামা সবার সামনে মেলে ধরে তার মজলুমস্তকে গতিশীল রূপ দেয় এবং বলে বেড়ায়, 'যেহেতু ওসমানের হত্যার পর আলী (আ.) খলীফা হয়েছেন, তাছাড়া ওসমানের হত্যাকারীদেরকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন- তরাং ওসমান হত্যার জন্য মূলতঃ আলীই (আ.) দায়ী।' এই বলে সে ভেউ ভেউ করে কাদতে থাকে যাতে মা ষের অ ভূতিকে আকৃষ্ট করতে পারে। তার এ প্রচেষ্টা সফলও হয়। কারণ, তার কান্নার সাথে র মিলিয়ে অনেকেই চোখের পানি ঝরায় ও শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে মজলুম খলীফার রক্তের প্রতিশোধ নিতে যেই কথা- সেই কাজ- এই রুপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। তারা মোয়াবিয়াকে আশ্বাস দেয়ঃ আমরা প্রস্তুত আছি, তুমি যা বলবে তাই আমরা পালন করতে রাজী আছি। এভাবে পদলোভী স্বার্থপর মোয়াবিয়া স্বয়ং মুসলমানদেরকে নিয়েই ইসলামের বিরুদ্ধে বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলে।

ইসলামের উষালগ্নের প্রহেলিকাময় ঘটনাবলী এবং নবীর (সা.) উম্মতের হাতে নবীর (সা.) সন্তানের হত্যার কারণ

ইতিহাসে বেশকিছু বিস্ময়কর ও নজিরবিহীন ঘটনা রয়েছে যেগুলোর কারণ এবং সূ খুজতে গিয়ে অনেকেই হয়তো বিপাকে পড়েত পারেন। এগুলোর মধ্যে একটি হল ইসলামের উষালগ্নেই সমসাময়িক অন্যান্য মতামত এবং আকীদা- বিশ্বাসকে দাবিয়ে এর বেপরোয়া প্রসার।

আরেকটি ঘটনা হল ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলন এবং বিদ্রোহ। আত্মীয়- অনাত্মীয়, চেনা-অচেনা নির্বিশেষে সবাই কুফার লোকদের বিশ্বাসঘাতকতার ই ্য টেনে ইমাম হোসাইন (আ.) কে বিরত রাখতে চেষ্টা করছিল। তারা যে ইমাম হোসাইনের (আ.) জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবেই এ চেষ্টা চালিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রহস্যের বিষয় হল যে, ইমাম হোসাইনও (আ.) তাদের চিন্তাধারাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেননি। অথচ মক্কা, কারবালা এবং কুফার পথে তার বিভিন্ন ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম হোসাইনের (আ.)ও একটা স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ছিল যা অনেক ব্যাপক ও দূরদর্শী। তার হিতাকাঙ্খীদের ভাবনা কেবল নিজের এবং পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। অথচ, ইমাম হোসাইনের (সা.) চিন্তা দীন, ঈমান ও আকীদার নিরাপত্তাকে নিয়ে। তাই, মারওয়ানের এক নসীহতের জবাবে ইমাম হোসাইন (সা.) বলেনঃ

و على الاسلام السلام اذ قد بليت الامة براع مثل يزيد

‘‘ইয়াযিদদের মতো কেউ যদি উম্মতের শাসক হয় তাহলে এখানেই ইসলামের ক্ষান্তি ।’’

মোয়াবিয়া ও ইয়াযিদের ইসলামী শাসন ক্ষমতা লাভ এবং ইসলামে অবিচল মুসলমানদের নিয়ে যথাক্রমে হযরত আলী (আ.) এবং ইমাম হোসাইনের (আ.) বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী গঠন ছিল ইসলামের উষালগ্নের প্রহেলিকাময় ঘটনাবলীর অন্যতম। এখানে দুটি বিষয়কে খতিয়ে দেখা দরকার। তাহলেই ইমাম হোসাইনের (আ.) বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা, এর কারণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদঘাটন করা আমাদের পক্ষে সহজতর হবে। প্রথমতঃ আবু ফিয়ানের নেতৃত্বে ইসলাম ও কোরআনের সাথে উমাইয়া বংশের তীব্র সংঘাত এবং দ্বিতীয়তঃ ইসলামী শাসন ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে তাদের সফলতা। ইসলামের সাথে উমাইয়াদের এহেন শত্রুতা লভ আচরণের কারণ হল যে, একাদিক্রমে তিন বংশ ধরে বিন হাশিম ও বনি উমাইয়ার মধ্যে গোষ্ঠীগত কোন্দল চলে আসছিল। অতঃপর যখন বিন হাশিম ইসলাম ও কোরআনের ধারক ও বাহক হবার গৌরব লাভ করে তখন বনি উমাইয়ারা ঈর্ষায় পুড়ে মরতে থাকে। ফলতঃ তারা বিন হাশিমকে সহ্য করতে পারলো না, সাথে সাথে ইসলাম ও কোরআনকেও না। দ্বিতীয় কারণ হলঃ তৎকালীন কোরাইশ গোে র নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে উমাইয়াদের পার্থিব জীবনধারার সাথে ইসলামী বিধানের অসাম স্য ও বৈপরিত । এতে তাদের প্রভূত্বমূলক প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়। তাদের ভাব ও মন- মানস ছিল বিধাবাদী ও বস্তুবাদী। উমাইয়াদের যথেষ্ট বুদ্ধি থাকলেও তাদের ঐ বস্তবাদী মানসিকতার কারণে খোদায়ী বিধান থেকে তারা উপকৃত হতে পারেনি। কারণ ঐশী শিক্ষাকে সে- ই অবনত মস্তকে গ্রহণ করতে পারে যার মধ্যে মর্যাদাবোধ, উম্মত আত্মা এবং মহত্বের আনাগোনা রয়েছে এবং যার মধ্যে সচেতনতা ও সত্যান্বেষী মনোবৃত্তি নিহিত আছে। অথচ উমাইয়ারা অতিশয় দুনিয়া চর্চা করতে করতে এসব গুণগুলোর সব ক'টি হারিয়ে বসেছিল। অগত্যা তারা ইসলামের সাথে শত্রুতায় নেমে পড়ে। পবি কুরআনেও এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সত্যকে মেনে নেবার সক্ষমতা যাদের আছে তাদেরকে ইশারা করে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

(لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا)

'যাতে তিনি (রাসূল) সচেতনদের সতর্ক করতে পারেন।'' (ইয়াসীনঃ ৭০)

(إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ)

কেবল তাদেরকেই সতর্ক করো যারা উপদেশ মেনে চলে'। (ইয়াসীনঃ ১১)

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)

'আমরা কোরআন অবতীর্ণ করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত। আর তা জালেমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।' (বনী ইসরাঈলঃ ৮২)

(لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)

‘এটি এজন্য যে, আল্লাহ কুজনদেরকে জন হতে পৃথক করবেন।’ (আনফাল : ৪৮)

মোদ্দকথা, আল্লাহর রহমত থেকে তারাই উপকৃত হতে পারবে যাদের প্রস্তুতি ও যোগ্যতা রয়েছে। এটি একটি খোদায়ী নীতি। আর উমাইয়াদের মধ্যে সে প্রস্তুতি না থাকায় তারা ইসলাম এবং কোরআনের অমিয় ধা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

রাসূলের (সা.) চাচা হযরত আব্বাস এবং আবু ফিয়ানের মধ্যে এক সাক্ষাতে তাদের মধ্যকার কথোপকথন থেকে আবু ফিয়ানের নিরেট ও অন্ধ আত্মার প্রকাশ ঘটে।

কিন্তু উমাইয়া দল কিভাবে চিরকাল শত্রুতা করেও হঠাৎ করে একটা তৎপর ইসলামী দল হিসাবে আত্ম প্রকাশ করলো- উপরন্তু তারা ইসলামের শাসন ক্ষমতাকে নিজেদের কুক্ষিগত করতে সক্ষম হলো? এ প্রশ্নের জবাবের রুতে একটা বিষয় উল্লেখ্য । তাহলো- নবনির্মিত ও নব প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতি হঠাৎ করেই শক্তিশালী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, চাই সে ঐক্য যত শক্তিশালীই হোক না কেন।

একটু চিন্তা করলে আমাদের সামনে একটি বিষয় স্পষ্ট হবে যে, আরবে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্টের ভিত মজবুত হতে না হতেই বিশেষ করে দ্বিতীয় খলীফার আমলে বেপরোয়াভাবে দেশজয় করে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটানো হয়। প্রকৃতপক্ষে তাড়াহুড়া করে নতুন নতুন দেশজয় করে ইসলাম প্রসারের চেয়ে বরং ধৈর্য ধরলে ইসলাম তার স্বাভাবিক গতিতে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশ- দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তো- এটাই কি অধিকতর সমীচীন ছিল না? ঐ তাড়াহুড়ার পরিণাম হিসাবে আমরা পরবর্তিতে দেখতে পাই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিদ্যমান এসব - দ্বন্দ বিভেদ। প্রাথমিক যুগে ইসলাম প্রসারে ঐ বেপরোয়া নীতির ফলশ্রুতিতে প্রথমতঃ একটা অসমত্ব মুসলিম সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং দ্বিতীয়তঃ তা আরবের ইসলামী সংস্কৃতিতে অনারব ও অনৈসলামী সংস্কৃতির অ প্রবেশের পথ খুলে দেয়। ফলে অতি শীঘ্রই আরব তার স্বাতন্ত্র্য ও ইসলামী সাংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলে।

সেদিনকার নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- এর পতাকাতলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল বটে এবং জাতি- বর্ণের ব্যবধানকে দ্রুত মোযেজার ন্যায় মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল বটে কিন্তু বিভিন্ন গো , ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, রীতি- নীতি, আদব- কায়দা এবং ভিন্ন আকীদা- বিশ্বাসে গড়ে ওঠা মা ষগুলোর দীন ও দীনের আইন- কা ন মেনে নেয়ার ক্ষে সমান যোগ্যতা ও প্রস্তুতি ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে একজন গাঢ় ঈমানদার হলে আরেকজন যে দুর্বল ঈমানের অধিকারী ছিল একথা অস্বীকার করার জো নেই। আরেকজন হয়তো সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল এবং কেউ কেউ অন্তরে কুফরী মনোভাবও হয়তো পোষণ করতো। এ ধরনের একটা জনসমষ্টিকে বছরের পর বছর তথা শতাব্দীর পর শতাব্দী অবিধ একটা নির্দিষ্ট সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে ধরে রাখা সহজ কথা নয়।

পবি কোরআন একাধিকবার মোনাফিকদের কথা উল্লেখ করেছে। মোনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক করার ধরন দেখে বোঝা যায় যে, এরা মারাত্মক। কোরআন মুসলমানদেরকে এই গুরুতর বিপদ থেকে রক্ষা করতে চায়। আব্দুল্লাহ ইবনে সালুল মদীনার মোনাফিকদের শীর্ষে ছিল। কোরআন 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' এর কথা উল্লেখ করেছে যারা দায়ে পড়ে কিংবা ইচ্ছায়- অনিচ্ছায় মুসলমানের তালিকায় নিজেদের নাম লিখিয়েছে। যাহোক, তারা যাতে আস্তে আস্তে খাটি মুসলমান হতে পারে সেদিকে তাদেরকে উৎসাহিত করা উচিত। বায়তুলমাল থেকে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে যাতে অন্ততপক্ষে তাদের অনাগত বংশধররা খাটি মুসলমান হয়ে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু তাই বলে তাদেরকে গুরুত্ব কোনো পদে নিয়োগ করা মারাত্মক ভুল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তার দয়া ও সদাচরণ থেকে কাউকে বঞ্চিত করতেন না। এমন কি মোনাফিক এবং 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' দেরকেও না। কিন্তু তাদের প্রতি সতর্কাবস্থা তিনি কখনই বর্জন করেননি। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায় কোনো দুর্বল ঈমানদার, মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম কিংবা মোনাফিক উমাইয়াদের কেউই ইসলামী শাসনযন্ত্রের ধারে কাছেও ঘেষতে পারেনি। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, রাসূলের (সা.) মৃত্যুর পর থেকে বিশেষ করে হযরত ওসমানের আমলে তারাই গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো কুক্ষিগত করে। রাসূলের (সা.) জীবদ্দশায়

মারওয়ান ও তার বাবা হাকাম মক্কা ও মদীনা থেকে নির্বাসন প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এ সময় তারা ফিরে আসার যোগ লাভ করলো। গত দুই খলীফার আমলেও তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা সংক্রান্ত হযরত ওসমানের অ রোধ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঐ মারওয়ানই ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি ও হযরত ওসমান হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত ওসমানের সময় উমাইয়ারা বড় বড় পদে আসীন এবং বায়তুল মালে হস্তক্ষেপ করে। যেটুকু তাদের ঘাটতি ছিল তা হল ধার্মিকতা। কিন্তু হযরত ওসমানের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে অদ্ভুত এক প্রতারণা ও ধোকাবাজির মাধ্যমে 'ধার্মিক' হবার গৌরবটাও তারা হাতে পায় এবং সেটাকেও তাদের লক্ষ্য চরিতার্থ করার কাজে নিয়োগ করে। আর এর বদৌলতেই মোয়াবিয়া দীন ও দীনের শক্তির নামে হযরত আলীর (আ.) মতো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ও বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়। এরপর থেকে মোয়াবিয়া আলেমদেরকে ভাড়া করে আরও একটা কৃতিত্ব বাড়ায়। অর্থাৎ এখন থেকে সে চারটি দিককে অস্ত্র হিসাবে ব্যাবহার করে মুসলমানদের শাসনমঞ্চে আবির্ভূত হয়। এগুলো ছিলঃ (১) বড় বড় রাজনৈতিক পদ (২) ধন- দৌলতের প্রাচুর্য (৩) অতিমা ায় ধার্মিকতা এবং (৪) দরবারী আলেম সমাজ।

হযরত ওসমানের যুগে উমাইয়াদের রাজনৈতিক উত্থান এবং বায়তুলমালের ছড়াছড়ি দেখে দীনদার এবং দুনিয়াদার উভয়পক্ষই ক্ষেপে ওঠে। দুনিয়াদাররা তাদের চোখের সামনে উমাইয়াদের ভোগ- বিলাস সহ্য করতে পারেনি কারণ তারা তাদের নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে সচেতন ছিল। আর দীনদাররা দেখিছল যে, ইসলামী সমাজের আ ধ্বংস অনিবার্য। এ কারণেই দেখা যায় যে, আমর ইবনে আস যেমন এর বিরোধিতায় নামে তেমনি আবুজর বা আম্মারও এর বিরোধিতা করেন। আমর ইবনে আস বলেঃ 'আমি এমন কোনো রাখালের পার্শ্ব অতিক্রম করিনি যাকে উসমানের হত্যার জন্যে উস্কানি দেই নি'।

হযরত আলী (আ.) জামালের যুদ্ধে বলেন :

لعن الله اولانا بقتل عثمان

'ওসমান হত্যা করতে আমাদের মধ্যে যারা অগ্রণী ছিল আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দিক।'

যখন হযরত ওসমান অবরোধের মধ্যে ছিলেন তখন হযরত আলী তাকে বিভিন্ন উপদেশও দিক-নির্দেশনার পাশাপাশি তাকে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করেছেন। কিন্তু মোয়াবিয়া এই ফেতনা-ফ্যাসাদের সূচনা ও পরিণতি সম্বন্ধে ভালভাবেই অবগত ছিল। তাই হযরত ওসমান তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেও মোয়াবিয়া তার বিশাল বাহিনী নিয়ে শামেই বসে থাকলো। কারণ সে বুঝেছিল যে, জীবিত ওসমানের চেয়ে মৃত ওসমানই তার জন্যে অধিক বিধাজনক। তারপর যখন হযরত ওসমানের হত্যার সংবাদ নলো অমনি হায় ওসমান! হায় ওসমান! বলে চীৎকার করে উঠলো। হযরত ওসমানের রক্ত ভেজা জামা লাঠির মাথায় করে ঘুরালো, মিম্বারে বসে শোক গাঁথা গেয়ে নিজেও যেমন কাঁদলো তেমনি অজস্র মা ষের চোখের পানি ঝরালো, আর কোরআনের এই আয়াত নিজের স্লোগানে পরিণত করেলাঃ

(وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)

‘যে মজলুম অবস্থায় নিহত হয় তার উত্তর রিকে আমরা কর্তৃত্ব দান করেছি’ (বনী ইসরাইল : ৪৪ (

ফলে ওসমানের রক্তের বদলা নেয়ার জন্যে মোয়াবিয়া ধন- দৌলত ও সরকারী পদগুলোর সাথে ধার্মিকতাকেও যুক্ত করতে সক্ষম হয় এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের একটা বড় অংশের অধিকর্তা হয়ে বসে। অন্যকথায়, ধার্মিকতার শক্তিকে রাজনীতি ও ধন- দৌলতের সাথে যোগ করে জনগণ তথা হযরত আলীর (আ.) অ সারীদেরকে সংকটাবস্থায় নিক্ষেপ করে। তাদেরকে বস্তুগত দিক থেকেও যেমন সংকটে ফেলে তেমনি আত্মিক ও মানিসকভাবেও। অবশ্য ধুমা ধার্মিকতা মজলুমের পক্ষ হয়েই অগ্রসর হয়। কিন্তু যদি জনগণের অজ্ঞতা এবং ক্ষমতাসীনদের প্রতারণার বলে দীন রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয় তাহলে আর দুর্দশার শেষ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সেদিনের হাত থেকে বাঁচান যেদিন দীন রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হবে।

এই ছিল ইসলামী খেলাফত লাভ ও আলেম সমাজের ওপর মোয়াবিয়ার কর্তৃত্ব লাভ করার সংক্ষিপ্ত কাহিনী, যা তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে সম্ভব হয়েছিল। যথাঃ উমাইয়াদের, বিশেষ করে

মোয়াবিয়ার কুটবুদ্ধি, পূর্ববর্তী খলীফাদের (ভ্রষ্ট) নীতি যারা এদেরকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় স্থান দিয়েছিল আর জনগণের অজ্ঞতা ও মূর্খতা।

মোয়াবিয়া তথা উমাইয়ারা দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যে অধিক প্রচেষ্টা চালায়;

(১) জাতি ব্যবধান সৃষ্টি যার ভিত্তিতে আরব, অনারবের চেয়ে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হতো।

(২) গো ব্যবধান সৃষ্টি যার ভিত্তিতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফের মতো লোকেরা লাখপতি হয় অথচ ফকীররা ফকীরই থেকে যায়।

আলী (আ.) দুনিয়া ত্যাগ করলে মোয়াবিয়া খলীফা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের সাথে সে দেখতে পেল যে, তার ধারণাকে বদলে দিয়ে মৃত্যু পরেও হযরত আলী (আ.) একটা শক্তি হয়েই বহাল রয়ে গেছেন। মোয়াবিয়ার ভাবলক্ষণ দেখে বোঝা যেত যে, এ কারণে সে বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল। তাই মোয়াবিয়া হযরত আলীর (আ.) বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডার যুদ্ধে নামে। আদেশ জারী করা হলো যে, মিম্বারে এবং খোতবায় হযরত আলী (আ.) কে অভিশাপ দিতে হবে। হযরত আলীর (আ.) অন্যতম সমর্থকদেরকে বেপরোয়া হত্যা করা হলো এবং বলা হলো যে, প্রয়োজনে মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে হলেও তাদেরকে বন্দী করবে যাতে হযরত আলীর (আ.) গুণ- মর্যাদা প্রচার না হয়। পয়সা খরচ করে হযরত আলীর (আ.) শানে বর্ণিত হাদীসসমূহ জাল করে উমাইয়াদের পক্ষে বর্ণনা করা হয়। তবুও বরাবরই উমাইয়া শাসনের জন্যে হযরত আলীর সমর্থকরা একটা হুমকি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

উমাইয়া শাসনামলের বিশ্লেষণ আমাদেরকে কেবল বিস্ময়াভিভূতই করে না বরং আমাদের জন্যে দিক নির্দেশনা বের হয়ে আসে। এটা যেনতেন কোনো ব্যাপার নয় যে, চৌদ্দশ' বছর আগের ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাব। কারণ, চৌদ্দশবছর আগের ইতিহাসের ঐ খণ্ড অধ্যায়ে ইসলামের মধ্যে যে বিষক্রিয়া সংক্রমিত হয়েছিল তা থেকে মুক্তির আশা দূর পরাহত। তাই এ নিয়ে গবেষণা করলে বরং আমাদের লাভ ছাড়া কোনো ক্ষতি নেই। উমাইয়াদের ঐ বিষাক্ত চিন্তার উপকরণকে ইসলামী চিন্তাধারার সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়।

ইসলামের খাঁটি রূপ দেখতে হলে এসব ভেজাল উপকরণের অপসারণ দরকার। খোদা না করুন, আজ আমরা যারা দিবারাি উমাইয়াদের গালি দেই তাদের মধ্যেও হয়তো উমাইয়া চিন্তাধারা বিদ্যমান। অথচ আমরা তাকে একবারে বি দ্ধ ইসলাম বলে মনে করি।

মোয়াবিয়া যখন দুনিয়া ত্যাগ করে তখন ইতোমধ্যে সংযোজিত কিছু বিদআত প্রথার সাথে আরও কয়েকটি প্রথার চলন করে যায়। যেমন :

এক. হযরত আলীকে (আ.) অহরহ অভিসম্পাত করা

দুই. টাকার বিনিময়ে হযরত আলীর (আ.) বিরুদ্ধে হাদীস জাল করা।

তিন. প্রথমবারের মতো ইসলামী সমাজে বিনাদোষে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করার অবাধ নীতি চালু করা। এছাড়া সম্মানীয়দের সম্মান খর্ব করা এবং হাত- পা কেটে বিকল করে দেয়া।

চার. বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা। যে প্রথা পরবর্তী খলীফারাও অস্ত্র হিসাবে ব্যাবহার করে। এসব অমানবিক প্রথার চলন মোয়াবিয়াই চালু করে যায়। সে ইমাম হাসান (আ.), মালেক আশতার, সা'দ ইবনে ওয়াক্কাছ প্রমুখকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে।

পাঁচ. খিলাফতকে নিজের খান্দানে আবদ্ধ রেখে রাজতন্ত্র প্রথা চালু করা এবং ইয়াযিদের মতো অযোগ্য ব্যক্তিকেও খলীফা পদে মনোনীত করা।

ছয়. গো বৈষম্যের স্তিমিতপ্রায় আগুনকে পুনরায় অগ্নিবৎ করা।

এগুলোর মধ্যে হযরত আলীকে (আ.) অভিসম্পাত করা, হাদীস জাল করা এবং ইয়াযিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ ছিল মোয়াবিয়ার কার্যকলাপের অন্যতম।

ইয়াযিদ ছিল মূর্খ ও নির্বোধ। সাধারণতঃ খলীফার পু দের মধ্যে যাকে ভাবী খলীফা হিসাবে মনোনীত করা হতো তাকে বিশেষ শিক্ষা- প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হত; যেমন আব্বাসীয়দের মধ্যে প্রচলন ছিল। কিন্তু ইয়াযিদ বড় হয় মরুভূমিতে রাজকীয় বিলাসিতায়। দুনিয়ার খবরও সে রাখতো না; পরকালেরও না। মোটকথা খলীফা হবার বিন্দুমা যোগ্যতাও তার ছিল না। ওসমানের সরলতার যোগে বায়তুলমাল লুন্ঠিত হয়েছিল, বড় বড় পদগুলো অযোগ্যদের হাতে চলে গিয়েছিল। কিংবা মোয়াবিয়া হযরত আলীর (আ.) বিরুদ্ধে অভিসম্পাত দেয়া, হাদীস জাল

করা, বিনা দোষে হত্যা, বিষ প্রয়োগ, খেলাফতকে রাজতন্ত্রে রুপান্তরিত করা প্রভৃতি প্রথা চালু করেছিল। কিন্তু ইয়াযিদের যুগে এসে ইসলাম আরো পর্যদস্ত হতে থাকে। দেশ- বিদেশের দূত এসে সরাসরি ইয়াযিদের কাছে যেত। কিন্তু, অবাক হয়ে দেখতো যে, রাসূলুল্লাহর (সা.) আসনে এমন একজন বসে আছে যার হাতে মদের বোতল, আর পাশে বসিয়ে রেখেছে রেশমী কাপড় পরা বানর। এরপরে ইসলামের ইজ্জত বলতে আর কি- বা থাকতে পারে? ইয়াযিদ ছিল অহংকারী, যৌবনের পাগল, ক্ষমতালোভী এবং মদ্যপ। এ কারণেই ইমাম হোসাইন (আ.) বলেছিলেনঃ 'যদি ইয়াযিদের মতো দুর্ভাগা উম্মতের শাসক হয় তাহলে এখানেই ইসলামের ইতি টানতে হবে। ইয়াযিদ প্রকাশ্যে খোদাদ্রোহিতায় নামে। অন্য কথায়, এতোদিনের গোপনতার পর্দা ছিন্ন করে ইয়াযিদ উমাইয়াদের আসল চেহারাটা প্রকাশ করে দেয়। ইসলাম যদি জিহাদ করার আদেশ দিয়ে থাকে- যদি অন্যায়ের গলা চেপে ধরার আদেশ দিয়ে থাকে তাহলে এটাই ছিল তা পালনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। তা নাহলে, এরপর আর কি নিয়ে ইসলামের দাবী উত্থাপন করার থাকে ?

কাজেই, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ইমাম হোসাইন (আ.) কেন বিদ্রোহ করতে গেলেন তাহলে একই সাথে তার এ প্রশ্নও করা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কেন আপোষহীন বিদ্রোহ করেছিলেন ? কিংবা, হযরত ইবরাহীম (আ.) কেন একা হয়েও নমরুদের বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন? আর কেনই বা হযরত মূসা (আ.) একমা সহযোগী ভ্রাতা হারুণকে নিয়ে ফেরাউনের রাজ প্রাসাদে দাড়িয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন?

এসবের জবাব খুবই স্পষ্ট যা ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নাস্তিকতা এবং খোদাদ্রোহিতাকে সমূলে উৎপাটন করাই ছিল এসব কালজয়ী মহা পুরুষদের মূল উদ্দেশ্য । আর নাস্তিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে বস্তুগত সাজ- সর াম না হলেও চলে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহই তাদের সহায়। তাই ইমাম হোসাইন (আ.)ও উমাইয়া খোদাদ্রোহিতা এবং ইয়াযিদী বিচ্যুতিকে ধুলিসাৎ করে দেবার জন্যেই একবারে অসহায় অবস্থায় পড়েও বিদ্রোহে নামেন। প্রকৃতপক্ষে তার এ পদক্ষেপ ছিল পূর্ববর্তী সকল নবী- রাসূলদেরই (আ.) আ করণ।

বুদ্ধিজীবীদের মতে, বিদ্রোহ তখনই মানায় যখন বিদ্রোহীদের অন্ততপক্ষে সমান সাজ-সর াম এবং শক্তি থাকে। কিন্তু, ঐশী-পুরুষদের বেলায় আমরা এই যুক্তির কোনো প্রতিফলন দেখি না। বরং তারা সবাই একবারে খালি হাতে তৎকালীন সর্ববৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। ইমাম হোসাইন (আ.)ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তাছাড়া ইমাম হোসাইন (আ.) যদি সেদিন ইয়াযিদ বাহিনীর সমান এক বাহিনী নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতেন তাহলে তার এ অসামান্য বিপ্লব ঐশী দ্যুতি হারিয়ে অতি নিস্প্রভ হয়ে পড়তো। এই দর্শন প্রতিটি ঐশী বিপ্লবের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। মানব সমাজে সংঘটিত অজস্র বিপ্লবের মধ্যে ঐশী বিপ্লবকে পৃথক মনে করার দুটি মাপকাঠি রয়েছেঃ

এক. ঐ বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিচার করে। অর্থাৎ এসব বিপ্লব ম ষ্যত্বকে উন্নত ও উত্তম করতে, মানবতাকে মুক্তি দিতে, একত্ববাদ ও ন্যায়পরায়ণতাকে রক্ষা করতে এবং জুলুম ও স্বৈরাচারের মূলোৎপাটন করে মজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্যেই পরিচালিত হয়। জমি-জায়গা বা পদের লোভে কিংবা গোষ্ঠীগত বা জাতিগত বিদ্বেষের কারণে নয়।

দুই. এসব বিপ্লবের উদ্ভব হয় স্ফুলিঙ্গের মতো। চারদিকে যখন মজলুম-নিপীড়ন এবং অত্যাচার ও স্বৈরাচারের ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারের বুক চিরে বারুদের মতো জ্বলে ওঠে এসব বিপ্লব। চরম দুর্দশায় নিমজ্জিত হয়ে মা ষ যখন দিশেহারা হয়ে পড়ে তখন উজ্জ্বল নক্ষ ে র মতো মা ষের ভাগ্যাকাশে আশার দীপ জ্বালিয়ে দেয় এসমস্ত ঐশী বিপ্লব। এই চরম দুর্দিনে মানবতাকে মুক্তি দেয়ার মতো দূরদর্শিতা একমা ঐশীপুরুষদেরই থাকে। কিন্তু, সাধারণ মা ষ একবারে হাল ছেড়ে দেয়-এমনকি কেউ প্রতিকারে উদ্যোগী হলেও তারা তাকে সমর্থন করতে চায় না। এ ঘটনা আমরা ইমাম হোসাইনের (আ.) বিপ্লবের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করি। তিনি যখন ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তখন সমসাময়িক তথাকিথত বুদ্ধিজীবীরা এটাকে অবাস্তব ব্যাপার বলে মনে করল। এ কারণে তাদের অনেকেই ইমাম হোসাইনের (আ.) সাথে একাত্মতা প্রকাশে বিরত থাকে।

কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) ভালভাবে জানতেন যে, এ মুহূর্তে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া অতীব প্রয়োজন। তাই অন্য কারও সহযোগিতা থাকবে কি- না সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নবী- রাসূলদের মতো নিজেই আগুনের ফুলকির মতো জ্বলে উঠলেন। হযরত আলী (আ.) বনী উমাইয়াদের ধূর্তামী সম্পর্কে বলেন :

انّها فتنة عمياء مظلمة

''তাদের এ ধোকাবাজি নিরেট ও অন্ধকারময় প্রতারণা।''

তাই ইমাম হোসাইন (আ.) এই অন্ধকার থেকে উম্মতকে মুক্ত করার জন্যে ইতিহাসে বিরল এক অসামান্য ও অবিস্মরণীয় বিপ্লবের পথ বেছে নেন।

হোসাইনী আন্দোলনের উপাদান সমূহ

এটা স্পষ্ট যে, কারবালার স্মৃতিকে অমর এবং চিরজাগরুক করে রাখার পেছনে মূল কারণ হল এটা একটা শিক্ষণীয় ও অ করণীয় ঘটনা। এটা ছিল ইতিহাসের একটি জ্বলন্ত অধ্যায় যা থেকে অনাগতকালের মুক্তি কামী মা ষ শিক্ষা গ্রহণ করে উপকৃত হবে। তাই আমরা সর্ব প্রথম ইতিহাসের এই খণ্ড অধ্যায়টুকুতে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহকে বিশ্লেষণ করতে চাই, তাহলে তা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

এ অধ্যায়ে আমরা ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনে বিদ্যমান উপাদানগুলো নিয়ে সার্বিক আলোচনা করবো। তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি নিয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করবো।

হোসাইনী আন্দোলনে একাধিক উপাদানের উপস্থিতি ছিল। আর এ কারণেই দৈর্ঘ- প্রস্থে কিংবা ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে কারবালার ঘটনা স্পষ্ট হলেও এ ঘটনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ও তার কারণসমূহ নির্ণয় করতে গিয়ে মতভেদ ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই জটিলতার কারণ খোদ ঘটনা প্রবাহের জটিলতা এবং ঘটনায় একাধিক উপাদানের সমাবেশ। বিভিন্ন উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম হোসাইনের (আ.) প্রতিক্রিয়া কখনো ছিল ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচক। কখনো বা কেবল আত্মরক্ষামূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন; আবার কখনো প্রতিরক্ষামূলক।

ইয়াযিদের পক্ষ থেকে বাইয়াত নেয়ার জন্যে ইমামের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) তাদের বাইয়াতের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। এখানে মূলত আত্মরক্ষা মূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন। এরপর আসে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। কুফায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে ইমামের (আ.) কাছে পৌছে যায় কুফাবাসীদের হাজার হাজার চিঠি । আর এক্ষেত্রে তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ইমাম হোসাইন (আ.) ইতিবাচক সাড়া দিলেন। আবার অন্য তিনি ইয়াযিদের বাইয়াতের

আদেশ কিংবা কুফাবাসীদের দাওয়াত- কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সরাসরি স্বৈরাচারী সরকারের বিরোধিতায় নামেন।

মুসলিম শাসন ক্ষমতায় বসে যারা ইসলামের মূলেই কুঠারাঘাত করছিল, মুসলিম উম্মাহকে যারা- সংঘাতে জর্জরিত করে দিচ্ছিল, হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানাচ্ছিল- ইমাম হোসাইন (আ.) তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। মুসলমানদের দীন- ঈমানের আ বিপদ সম্পর্কে তিনি সবাইকে হুশিয়ার করে দিলেন।

সবশেষে তিনি বললেন- আজ আর কোনো মুসলমানের মুখ বুজে বসে থাকা উচিত নয়। সাথে সাথে তিনি কারো সাহায্যের আশা বাদ দিয়েই নেমে পড়লেন।

এখানে এসে আমরা দেখি যে, ইয়াযিদের পক্ষে বাইয়াত চেয়ে পাঠানোর কথাও যেমন ইমাম হোসাইন (আ.) উল্লেখ করেননি তেমনি কুফাবাসীদের আমন্ত্রণ প্রসঙ্গেও তিনি কিছু বলেননি। তাহলে প্রকৃত ব্যাপার কি দাঁড়ালো? ইমাম হোসাইন (আ.) কি কেবল ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত করবেন না বলে, কিংবা কুফাবাসীদের সাহায্যের আশ্বাস পেয়েই বিদ্রোহ করতে উদ্যোগী হলেন? নাকি স্বৈরাচারী ও খোদাদ্রোহী সরকারকে উৎখাত করার জন্যেই তিনি আন্দোলন রু করলেন? এসব উপাদানের মেধ্যে বাস্তবিকপক্ষে কোনটি ইমাম হোসাইন (আ.) কে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং কিসের ভিত্তিতেই বা ইমাম আন্দোলন করেছিলেন আমরা তার পুঙ্খা পুঙ্খ বিশ্লেষণ করবো।

ইয়াযিদের সাথে মোয়াবিয়ার এমন মৌলিক পার্থক্য ছিল যে, ইমাম হোসাইন (আ.) মোয়াবিয়ার সময়ে চুপ থাকলেন, অথচ ইয়াযিদ ক্ষমতাসীন হতে না হতেই তিনি আর একদণ্ড দেরী করলেন না? তাছাড়া ইমাম হাসান (আ.) মোয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করতে রাজী হলেন কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) ইয়াযিদের সাথে কোনো আপোষ করাকে ‘‘নাজায়েজ’’ বলে গণ্য করলেন।

এগুলো সবই কেবল । হোসাইনী আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করলে এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন দেখা দেয়। আমরা এখানে উদ্ধৃত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজতে চেষ্টা করবো। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত তিনটি উপাদানের তিনটিই ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনে বিদ্যমান। অর্থাৎ তার আন্দোলনের

একটা অংশ বাইয়াত প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে, একটা অংশ আমন্ত্রণ প্রসঙ্গ নিয়ে এবং অপর অংশটি উদ্ভূত সামাজিক ফেতনা- ফ্যাসাদ ও বিদআতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

প্রথমে আমরা বাইয়াত প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করে দেখি যে, এটা হোসাইনী আন্দোলনে কতটুকু প্রভাব বিস্তারকরেছিল এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম হোসাইন (আ.) কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। আরও দেখবো আরও দেখবো যে, যদি অন্য কোনো প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে কেবল বাইয়াত প্রসঙ্গই সামনে আসতো তাহলে তখন ইমাম হোসাইন (আ.) কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতেন।

মোয়াবিয়া ইবনে আবু ফিয়ানের মুসলিম খিলাফত লাভের তিক্ত অভিজ্ঞতার সাথে আমরা সবাই কম- বেশী পরিচিত। ইমাম হাসানের (আ.) সহযোগীরা যখন তীব্র অ ৎসাহ প্রকাশ করলো তখন তিনি মোয়াবিয়ার সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে মনস্থ করলেন। কিন্তু সন্ধি সনদের কোথাও মোয়াবিয়ার খেলাফতকে স্বীকৃতি প্রদান সূচক কোনো বাক্যের উল্লেখ ছিল না ! বরং বলা হয়েছিল যে, মোয়াবিয়া একান্তই যদি হুকুমত করতে চায় তাহলে তা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত করুক। কিন্তু তারপর ক্ষমতা থাকবে মুসলমানদের হাতে। তারা যাকে উপযুক্ত মনে করবে তাকেই শাসক নির্বাচন করবে।

মোয়াবিয়ার যুগ পর্যন্ত মুসলিম শাসনে রাজতন্ত্রের কোনো প্রভাব ছিল না। তখন পর্যন্ত খলীফা নির্ধারণের ব্যাপারে মা দুটো ধারণা প্রচলিত ছিল:

এক. খেলাফত ধু তারই অধিকার যাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)আল্লাহর আদেশে মনোনীত করে গেছেন।

দুই.জনগণ নিজেরাই তাদের খলিফা নির্বাচন করবে।

কিন্তু ইয়াযিদের যুগ থেকে খলীফা নির্ধারণের পূর্ব দুটি ধারণাকে অমান্য করে এক নতুন তৃতীয় প্রথার চলন ঘটানো হয় এবং প্রথমবারের মতো মুসলিম শাসন ব্যাবস্থাকে রাজতন্ত্রে পরিণত করা হয়। অর্থাৎ এখন থেকে খলীফা নির্ধারণে রাসূলের (সা.) নিয়োগের যেমন কোনো মূল্য নেই তেমনি জনগণের ক্ষমতাকেও হীন করা হল।

মোয়াবিয়ার সাথে সম্পাদিত সন্ধিপে ইমাম হাসান (আ.) প্রদত্ত বিভিন্ন শর্তগুলোর মধ্যে একটি ছিল যে, মোয়াবিয়া মুসলমানদের ভবিষ্যত নিয়ে নাক গলাবে না। তার জন্যেই ইসলামকে যে মূল্য দিতে হয়েছে এতটুকুই যথেষ্ট । এরপর থেকে মুসলমানরা যেন দম ছেড়ে বাঁচতে পারে। মোট কথা মোয়াবিয়া যে ক'দিন আছে সে ক'দিন কষ্টে- শিষ্টে পার হলেই রক্ষা। এরপরে মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারণে মোয়াবিয়ার হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার থাকবে না।

কিন্তু মোয়াবিয়া তার চিরকালের স্বভাব অ যায়ী এবারও ইমাম হাসানের (আ.) সাথে প্রতিশ্রুত সন্ধির প্রতিটি শর্তকেই পদদলিত করে তার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে থাকে। এমন কি বিষ প্রয়োগে ইমাম হাসানকে (আ.) শহীদ করার মতো অমা ষিক কাজ করতেও সে দ্বিধা বোধ করেনি। মোয়াবিয়ার মূল অভিসন্ধি ছিল যে কোনো মূল্যে খেলাফতের চাবি উমাইয়া বংশের হাতছাড়া করা যাবে না। ঐতিহাসিকরা বলেন, মোয়াবিয়া এ লক্ষে এমন কিছু করে যেতে চেয়েছিল যাতে খেলাফতকে লতানী আকারে গড়ে তোলার পক্ষে গ্যারান্টি হয়ে থাকে। কিন্তু মোয়াবিয়া বুঝত যে, এ কাজ আপাতত সম্ভব ছিল না। তাই অনেক চিন্তা- ভাবনা এবং একান্ত বিশ্বস্তদের সাথে শলা- পরামর্শের পরও মোয়াবিয়া কোনো নির্দিষ্ট উপায় খুজে বের করতে ব্যর্থ হয়। সে এ ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী ছিল না। আর তার এ মতলব জনগণের সকাশে প্রকাশ করতেও সাহস পাচ্ছিল না।

ঐতিহাসিকদের মতে, সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি মোয়াবিয়াকে এ ব্যাপারে আশাবাদ ও সফলতার নিশ্চয়তা প্রদান করে সে হল ''মুগাইরা ইবনে বা''। অব মুগাইরার এ উদ্যোগের পিছনেও একটা দুরভিসন্ধি ছিল। সে আগ কুফার গভর্ণর ছিল। কিন্তু মোয়াবিয়া তাকে বরখাস্ত করায় সে খুব অসন্তষ্ট হয়। ধোকাবাজি ও ফন্দীবাজিতে ইতোমধ্যেই সে ''আরবের চাম্পিয়ান'' খ্যাতি লাভ করেছিল। শাসনযন্ত্রের এহেন সংকটাবস্থায় সে কুফার গভর্ণর পদ পুনরায় হাতে পাবার আশা নিয়ে এক ফন্দী করে বসলো। শামে এসে সে ইয়াজিদকে বললো- 'কেন যে মোয়াবিয়া তোমার ব্যাপারে কুন্ঠা করছে বুঝতে পারছিনা, আর কত দেরী করবে?' ইয়াযিদ বলল, 'আমার বাবা ভয় পায়, কেননা এ কাজ হয়তো সফল নাও হতে পারে।'

সাথে সাথে মুগাইরা বলে উঠলো, না- না, অবশ্যই সম্ভব। ভয় কিসের? তোমাদের কথার অবাধ্য হবে এ সাহস কার আছে? শামের লোকজন মোয়াবিয়ার কথায় ওঠে আর বসে। মদীনায়ও যদি অমুককে পাঠানো হয় তাহলে সব শায়েস্তা হয়ে যাবে। আর বাকী থাকে কেবল কুফা। ঠিক আছে আমি নিজেই ওখানকার ভার নিচ্ছি ।

একথা নে ইয়াযিদ উৎসাহিত হলো এবং মোয়াবিয়ার কাছে ব্যাপারটা খুলে বললো। মোয়াবিয়া মুগাইরাকে ডেকে পাঠাল। বাকপটু মুগাইরা এ যোগের সদ্ব্যব্যাবহার করে তীক্ষ্ণ যুক্তি দিয়ে মোয়াবিয়াকে কাবু করে ছাড়লো। সে মোয়াবিয়াকে বোঝাতে সক্ষম হল যে, সবকিছুই অ কুলে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আর কুফার ব্যাপারটা একটু জটিল হলেও তা দেখার ভার আমার ওপরই রইলো। অবশ্য এসব ষড়যন্ত্র ইমাম হাসানের (আ.) শাহাদাতের পর ও মোয়াবিয়ার শেষ বয়সেই সংঘটিত হয়।

এরপর ঘটে যায় অনেক ঘটনা। কুফা ও মদীনার জনগণ মানতে রাজী হল না। অগত্যা মোয়াবিয়া নিজে মদীনায় গিয়ে গণ্যমান্যদের, যেমনঃ ইমাম হোসাইন (আ.), আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। এসব আলোচনায় মোয়াবিয়া তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, ইয়াযিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়াটাই এখন ইসলামের জন্যে কল্যাণকর। কেননা ইয়াযিদ খলীফা হলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেব না। তরাং আপনারা এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান। কার্যত শাসন ক্ষমতা আপনাদের হাতেই রইলো। কাজেই আপনারা আর দেরী না করে ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত করে ফেলুন। এভাবে নানা কথা বলে মোয়াবিয়া তাদেরকে রাজী করাতে চাইলো। কিন্তু কোনোমতেই সে তাদেরকে রাজী করাতে পারলো না। মোয়াবিয়া বিফল হল। এবার মদীনার মসজিদে গিয়ে তার শেষ প্রচেষ্টা চালালো। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মসজিদে দাড়িয়ে বললোঃ তোমাদের গণ্যমান্যরা আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। তরাং তোমরাও ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত করে ফলে। কিন্তু তারাও মোয়াবিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে।

এই বিফলতার জন্যে মোয়াবিয়া মৃত্যুকালে ইয়াযিদ সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। সে ইয়াজিদকে নসিহত করে যায়ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের কাছ থেকে বাইয়াত নেয়ার জন্যে এভাবে আচরণ করবে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে ওভাবে আচরণ করবে, ইমাম হোসাইনের (আ.) সাথে এভাবে আচরণ করবে ইত্যাদি। মোয়াবিয়া বিশেষ করে ইমাম হোসাইনের (আ.) সাথে কোমল ব্যাবহার করার জন্যে ইয়াজিদকে নসিহত করে। কেননা ইমাম হোসাইন (আ.) নবীর সন্তান। জনগণ তাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাই তার সাথে কোনো সংঘাতে যাওয়া আদৌ ঠিক হবে না। মোয়াবিয়া ভালভাবেই অবগত ছিল যে, যদি ইমাম হোসাইনের (আ.) সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং তার রক্তে হাত লাল করে তাহলে ইয়াযিদের রাজত্বের আয়ু শেষ হয়ে যাবে। মোয়াবিয়া ধুর্ত বুদ্ধি দিয়ে বেশ ভবিষ্যৎ বাণীও করতে পারতো এবং খ্যাতিমান রাজনীতিকদের মতোই তা ফলে যেত। পক্ষান্তরে, ইয়াযিদ ছিল বয়সে অপরিপক্ক, বুদ্ধিতে আমড়া কাঠের ঢেকি আর রাজনীতিতে পুরোপুরি অনভিজ্ঞ । রাজকীয় ভোগ বিলাসে জীবন যাপন করে সে আরাম-আয়েশ ছাড়া কিছুই জানে না, যৌবনের অহংকারে ছিল গদগদ। পাশাপাশি ক্ষমতার লোভও তাকে আবিষ্ট করে ফেলে এবং এজন্য বিন্দু মা ধৈর্য ধরার অবস্থাও তার ছিল না। তাই মোয়াবিয়ার মৃত্যুর অব্যববিহত পরেই সে এমন এক কাজ করে বসলো যাতে উমাইয়া খান্দানই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হল। ইয়াযিদ দুনিয়া ছাড়া কিছুই বুঝতো না। কিন্তু এ ঘটনার পরিণতিতে দুনিয়াও হারিয়ে বসে। অপরপক্ষে ইমাম হোসাইন (আ.) শহীদ হয়ে তার মহান লক্ষে পৌঁছেন। তার আত্মিক- আধ্যাত্মিক সমস্ত লক্ষ্যই অর্জিত হয়। আর উমাইয়ারা সবকিছু হারিয়ে চরমভাবে পতনের সম্মুখীন হয়।

৬০ হিজরীর ১৫ই রজব তারিখে মোয়াবিয়ার মৃত্যু হলে ইয়াযিদ মদীনার গভর্নরকে চিঠি লিখে বাবার মৃত্যুর খবর জানায় এবং জনগণের কাছ থেকে তার অ কূলে বাইয়াত নেবার আদেশ করে। ইয়াযিদ জানতো যে, মদীনাই সবকিছুর কেন্দ্র এবং সবাই মদীনার দিকে তাকিয়ে আছে। এ কারণে সে ঐ চিঠির ভিতরে একটা চিরকুটে ইমাম হোসাইনের (আ.) কাছ থেকে বাইয়াত

নেবার জন্যে কড়া আদেশ দিয়ে পাঠায়। আরও বলে যে, ইমাম হোসাইন (আ.) যদি বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তার মস্তক ছিন্ন করে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

এভাবে ইমাম হোসাইন (আ.) বাইয়াত তথা প্রথম সমস্যার সম্মুখীন হলেন। যে বাইয়াতের অর্থ হতো সকল ইয়াযিদী কার্যকলাপের স্বীকৃতি দেবার পাশাপাশি আরও দুটো নতুন বিদআত প্রথার স্বীকৃতি দেবারই নামান্তর। এক হলঃ ইয়াজিদকে মেনে নেবার প্রশ্ন নয়, বরং একটা বিদআত প্রথা বা রাজতন্ত্রকে মেনে নেয়া। দ্বিতীয়ত: ইয়াযিদ ধু ফাসেক বা লম্পটই ছিল না- প্রকাশ্যে এবং জনগণের সকাশেই সে এসব ক্রিয়াকলাপ চালাতো। এরূপ ব্যক্তিকে মুসলিম খিলাফতে বসানো অর্থাৎ ইসলাম ও কোরআনের মুখেই কলংক লেপন। মোয়াবিয়াও ফাসেক ছিল বটে। কিন্তু সে একটা জিনিস ভালভাবেই অ ধাবন করতো যে, যদি তাদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে বাহ্যিকভাবে অন্তত ইসলামী বেশভূষা বজায় রাখতে হবে। যদিও ইসলামকে ভাঙিয়েই তাদের এই আমীর- ইমারত। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের বিভিন্ন জাতির অসংখ্য মা ষ বাগদাদ কিংবা শামের শাসনকে মেনে নিয়েছিলক্ষ্যকেবলমা ইসলাম ও কোরআনের খাতিরেই। এ কারণে মোয়াবিয়ার মত চালাক রাজনীতিবিদরা বুঝতে পেরেছিল যে, এই মুসলিম সমাজকে দাবিয়ে রাখতে হলে তাদেরকে অন্তত জাহেরী চেহারাকে ইসলামী করে রাখতে হবে। নতুবা যদি ফাঁস হয়ে যেত যে, মুসলমানদের রক্ষকরা নিজেরাই ভ্রান্ত তাহলে সেদিনই তারা রুখে দাঁড়াতো।

কিন্তু ইয়াযিদের এ জ্ঞানটুকুও ছিল না। বরং প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের অপমান করে কিংবা শরীয়তের বিধান লংঘন করে সে তৃপ্তি পেত। হয়তো মোয়াবিয়াও মদ পান করতো আল)- গাদীর ১০ খণ্ড, ১৭৯ পাতা দ্রষ্টব্য(। কিন্তু তার প্রকাশ্যে লোকালয়ে বসে মদপান করার কিংবা মাতাল অবস্থায় মসজিদে ঢোকার মত কোনো সাক্ষ্য - প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইয়াযিদের কাছে এসব ব্যাপার অত্যন্ত মামুলি মনে হতো। মদ্যপান, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আবোল- তাবোল বকা, বানর নিয়ে খেলা করা এ ধরনের অগণিত হারাম কাজকে সে হালাল মনে করতো। এ কারণেই ইমাম হোসাইন (আ.) বলেছিলেনঃ .

و على الاسلام السلام اذ قد بليت الامة براع مثل يزيد

‘ইয়াযিদের মতো লোক যদি উম্মতের রক্ষক হয় তাহলে এখানেই ইসলামের ক্ষান্তি ’। (মাকতালুল মোকাররাম)

এককথায় ইয়াযিদ ও অন্যদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। অন্যকথায় তা প্রকাশ করতে হলে বলতে হয় যে, স্বয়ং ইয়াযিদের অস্তিত্বই ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রচার। আর এই ইয়াযিদ চায় ইমাম হোসাইনের (আ.) কাছ থেকে বাইয়াত নিতে !!! ইমাম হোসাইন (আ.) বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলতেনঃ আমি কোন ক্রমেই ওদের হাতে হাত দেব না- আর ওরাও আমার থেকে বাইয়াত চাইেত নিরস্ত হবে না।

এভাবে বাইয়াত করাতে বা করার জন্যে তীব্য চাপের সৃষ্টি করা হয়। ইমাম হোসাইনের (আ.) মত ব্যক্তি বাইয়াত না করে স্বাধীনভাবে জনগণের মরেধ্য ঘুরে বেড়াবে এর চেয়ে বিপজ্জনক ওদের জন্যে আর কি হতে পারে? তাই ইমাম হোসাইনকে (আ.) ক্ষমা করা ইয়াযিদের জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা বাইয়াত না করে তিনি বুঝাতে চান যে, ‘আমি তোমাদেরকে মানি না, তোমাদের আইন- কা ন মেনে চলারও কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। ধু তাই নয়, এজন্যে আমি চুপ করে বসে থাকবো না, বরং তোমাদেরকে সমূলে উৎখাত করেই তবে ছাড়বো।’ আর উমাইয়াদেরকে সমূলে উৎখাত করার মতো ক্ষমতা একমা ইমাম হোসাইনেরই (আ.) ছিল। এ সত্য বুঝতে পেরে ইয়াযিদ ইমাম হোসাইনের (আ.) কাছে বাইয়াত চেয়ে জোর তাগাদা পাঠায়। কিন্তু এসব তাগাদা এবং চাপের মুখে ইমাম হোসাইনের (আ.) করণীয় কি?

এ পর্যায়ে তিনি নেতিবাচক জবাব দিলেন। তারা বললঃ আপনাকে বাইয়াত করতে হবে।

ইমাম জবাব দিলেনঃ ‘না’

তারা বলল, ‘যদি বাইয়াত না করেন তাহলে মৃত্যু অনিবার্য’

ইমাম জবাবে বললেন, ‘মৃত্যু বরণ করতে রাজী আছি কিন্তু বাইয়াত করতে পারবো না।’

ইয়াযিদের আদেশ পেয়ে মদীনার গভর্ণর ইমাম হোসাইনকে (সা.) ডেকে পাঠাল। উমাইয়া গভর্ণররা সচরাচর নিষ্ঠুর প্রকৃতির হলেও মদীনার গভর্ণর ওয়ালীদ ছিল একটু ব্যতিক্রম। ইমাম হোসাইন (আ.) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে মসজিদুন্নবীতে বসে ছিলেন। খলীফার দূত এসে

তাদের 'দু'জনকেই গভর্ণরের সাথে দেখা করতে বলে। তারা দূতকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি ফিরে যাও। আমরা পরে আসছি।' আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ইমাম হোসাইনকে (আ.) জিজ্ঞাসা করলো, 'হঠাৎ করে গভর্ণর আমাদেরকে ডেকে পাঠাল যে ! আপনার কি ধারণা?' ইমাম জবাবে বললেন :

اظنّ انّ طاغيتهم قد هلک

'আমার মনে হচ্ছে মোয়াবিয়া পটল তুলেছে ও ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত করার জন্যে ই আমাদেরকে ডাকা হয়েছে।'

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর সেদিনই রাতের অন্ধকারে অচেনা পথ ধরে মক্কায় এসে আশ্রয় নেয়। এদিকে ইমাম হোসাইন (আ.) বনী হাশিম বংশের কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে দরবারে গেলেন। দরবারে ঢোকার আগে তিনি তাদেরকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বললেন, 'আমার ডাক না শোনা পর্যন্ত তোমাদের কেউ ভিতরে ঢুকবে না।'

দরবারে ওয়ালীদের সাথে পাপিষ্ট মারওয়ানও ছিল। মারওয়ান এক সময় মদীনার গভর্ণর ছিল। ইমাম হোসাইনকে (আ.) দেখে ওয়ালীদ ইয়াযিদের চিঠি বের করলো। ইমাম জিজ্ঞেস করলেনঃ 'কি চাও?'

ওয়ালিদ অত্যন্ত কোমলভাবে কথা বলতে রু করলঃ 'জনগণ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত করেছে। মোয়াবিয়ার বহু দিনের খায়েশও ছিল এটা হোক। তাছাড়া, বর্তমানে ইসলামের জন্যেও এটা কল্যাণকর। তাই আপনিও ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত করে ফেলুন। পরে আপনার কথামতো সব কিছুই চলবে। ত্রুটি- বিচ্যুতি সমাধান করে ফেলা হবে।' ইমাম বললেন, 'তোমরা কেন আমার কাছে বাইয়াত চাচ্ছ ? আল্লাহর জন্যে তো নয়, আমার বাইয়াতের মাধ্যমে তোমাদের শরীয়ত বিরোধী খিলাফতকে শরীয়তসিদ্ধ করার জন্যে ও তো নয়, বরং জনগণের জন্যে ই তো? ওয়ালিদ বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।'

ইমাম বললেন, 'তাহলে এই ফাকা দরবারে তিনজনের উপস্থিতিতে আমি বাইয়াত করি এতে তোমাদের কি লাভ হবে? বরং পরে হবে।'

ইমাম হোসাইন (আ.) যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মারওয়ান আর সহ্য করতে না পেরে তেড়ে উঠল এবং ওয়ালীদকে দোষারোপ করে বললো, 'কি বলছো। এখান থেকে চলে যাবার অর্থ তিনি বাইয়াত করবেন না। পরে আর বাইয়াত আদায় করাও সহজ হবে না। তুমি এক্ষুণি খলীফার আদেশ পালন কর।'

মারওয়ানের একথা নে ইমাম হোসাইন (আ.) ফিরে দাঁড়ালেন এবং তার জামার কলার ধরে উচুঁ করে ফেলে দিলেন। অতঃপর রাগের স্বরে বললেন, 'এ ধরনের কথা বলার কোনো অধিকার তোমার নেই।' (দ্রঃ তারিখে তাবারী; ৬১৮৯/, কিতাবুল ইরশাদ ২(৩৩/

এ ঘটনার পর থেকে ইমাম হোসাইন (আ.) মা তিনদিন মদীনায় কাটান। রাতের বলোয় তিনি রাসূলের (সা.) কবরে এসে দোয়া কালাম পড়তেন এবং আল্লাহর কাছে বলতেনঃ 'হে মাবুদ, আমার সামনে এমন রাস্তা খুলে দিন যে রাস্তা আপনার পছন্দনীয়।' তৃতীয় তথা শেষের দিন রাতের বলোয় ইমাম হোসাইন (আ.) যথারীতি নবীজির (সা.) মাজারে এলেন, অনেক দোয়া- কালাম পড়ে তিনি অঝোরে কাদতে লাগলেন এবং ক্লান্ত অবস্থায় এক সময় ওখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ভিতরে স্বপ্নে দেখলেন যা প্রকৃতপক্ষে ইমাম হোসাইনের (আ.) চলার জন্যে পথের দিশা দিল। রাসূলুল্লাহর (সা.) কাছে প্রথমে তিনি জোর জবরদস্তি এবং অত্যাচার করার জন্যে উম্মতের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন এবং এহেন দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্যে তিনি মৃত্যু কামনা করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাবে বললেন :

يا حسين، انّ لک درجة عند الله لا تنالها الا بالشهادة

'হে হোসাইন! আল্লাহর নিকেট তোমার জন্য একটি মর্যাদা রয়েছে যা শাহাদাত ব্যতীত তুমি অর্জন করতে পারবে না।'

এবার ইমাম হোসাইন (আ.) তার করণীয় স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পরলেন। পরের দিন ভোর বলোতেই পরিবার- পরিজন নিয়ে মক্কাভিমুখে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি কোনো আঁকা- বাকা বা অচেনা পথ বেছে নিলেন না বরং মদীনা থেকে মক্কায় যাবার পরিচিত পথ ধরেই এগিয়ে চললেন। তার সঙ্গীদের অনেকেই উৎকন্ঠা প্রকাশ করে বলেনঃ

يا ابن رسول الله ! لو طنكّبت الطريق الاعظم

‘হে ইমাম! আপনি সোজা পথে না গিয়ে বরং কোনো অচেনা পথ দিয়ে চললেই বোধহয় ভাল করতেন। কেননা ইয়াযিদী গুপ্তচররা যে কোনো মুহুর্তে আপনার পথ রোধ করে একটা কলহ-বিবাদের সৃষ্টি করতে পারে।’ কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন বীরেরবীর, তার সাহস ছিল খোদায়ী বিশ্বাসে ভরপুর। তাই সঙ্গীদের এ ধরনের কোনো আশংকায় দৃষ্টিপাত না করে তিনি চেনা পথেই অগ্রসর হলেন এবং বললেন, ‘আমি পলাতকের বেশ পরতে মোটেই আগ্রহী নই। এই চেনা পথেই যাব- আল্লাহ যা চায় তা- ই হবে।’

যাহোক হোসাইনী আন্দোলনে সর্ব প্রথম যে কারণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল তা যে বাইয়াত প্রসঙ্গই ছিল তাতে কোনো দ্বিমত নেই। ইতিহাস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়। ইমাম হোসাইনের (আ.) কাছ থেকে বাইয়াত আদায় করার আদেশ জারী করে ইয়াযিদ বিশেষ চিঠিতে লিখেছিল :

خذ الحسين بالبيعة اخذا شديدا

‘ইমাম হোসাইনকে (আ.) কঠোরভাবে ধরে বাইয়াত আদায় করে ছাড়বে।’ (মাকতালুল মোকাররামঃ ১৪০ (

অপরদিকে ইমাম হোসাইন (আ.)ও কঠোরভাবে এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তার এ সিদ্ধান্ত ছিল পাহাড়ের মতো অটল। তাই কারবালার ময়দানে

চরম দুর্দশায় ফেলে ইবনে সাদ ভেবেছিল এখন হয়তো ইমাম হোসাইন (আ.) আপোষ- রফা মেনে নেবেন। এ উদ্দেশ্যে এক আলোচনায় সে ইমাম হোসাইনকে (আ.) আপোষ করতে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু কোনো প্রলোভনই ইমাম হোসাইনের (আ.) প্রতিজ্ঞায় ফাটল ধরাতে পারেনি। আ রার দিনের বিভিন্ন ভাষ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত ও ইমাম হোসাইন (আ.) তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। তিনি এক ভাষ্যে বলেন, .

لا، و الله لا اعطيكم بيدى اعطاء الذّليل و لا اقرّ اقرار العبيد.

‘না। আল্লাহর কসম করে বলছি যে, কিছুতেই আমি তোমাদের হাতে হাত মিলাবো না। এমনকি আজ- এ দূরবস্থার মধ্যে পড়েও, স্বীয় সঙ্গী সাথীদের মৃত্যু নির্ঘাত জেনেও, পরিবার- পরিজনদের বন্দীদশা অনিবার্য জেনেও আমি আমার মহান লক্ষ্যকে তোমাদের কাছে বিকিয়ে দেব না।’ (কিতাবুল ইরশাদঃ ৩৪৬(

ইমাম হোসাইনের (আ.) এই অসহযোগ নীতি তথা বিরুদ্ধবাদী ভূমিকা নেয়া রু হয় মোয়াবিয়ার আমলের শেষের দিক থেকেই। মোয়াবিয়ার মৃত্যুর সাথে সাথে বাইয়াত গ্রহণে ইয়াযিদের তাড়াহুড়ো এবং কড়াকড়ির ফলে ইমাম হোসাইনের (আ.) ভূমিকাও ত্বরান্বিত হয়।

দ্বিতীয় যে কারণ হোসাইনী আন্দোলনে উপাদান হিসেবে কাজ করেছে তা ছিল কুফাবাসীদের দাওয়াত প্রসঙ্গ । মূলতঃ ইমাম হোসাইনের (আ.) উপর পরিচালিত মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড কারবালার ভূমিতে সংঘটিত হবার পিছনে কুফাবাসীদের দাওয়াতই ছিল মুখ্য কারণ। ৬০ হিজরীতে মোয়াবিয়ার মৃত্যু হলে কুফাবাসীরা ইমাম হোসাইনকে (আ.) নিজেদের ইমাম বলে মেনে নেয় এবং সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে তাকে কুফায় আসতে আমন্ত্রণ জানায়। ইমাম হোসাইন (আ.)ও তাদের দাওয়াত কবুল করেন এবং মক্কা ছেড়ে কুফাভিমুখে বেরিয়ে পড়েন’। কিন্তু চপলমতি কুফাবাসীরা ইমামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং শেষ পর্যন্ত তারাই ইয়াযিদী বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে ইমাম হোসাইনকে (আ.) হত্যা করলো।

এ ইতিহাস যখন পড়া হয় তখন অনেকের মনে এ ধরনের ধারণা জন্মে যে, ইমাম হোসাইন (আ.) মদীনায় চুপচাপ বসেছিলেন- ভালই ছিলেন কোনো ঝুক্কি - ঝামেলা ছিল না। ধু মা যে কারণে তিনি মদীনা ছেড়ে বেরিয়ে আসনে তা হলো কুফাবাসীদের আহবান। তবে, এ ধারণা একবারেই ভিত্তিহীন। কেননা ইমাম হোসাইন (আ.) ইয়াযিদ ক্ষমতাসীন হবার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ঐ রজব মাসেরই শেষার্ধ নাগাদ মক্কার পথে রওয়ানা হন এবং তখন কুফাবাসীদের কোনো চিঠিতো পৌঁছেইনি উপরন্তু মদীনায় কি ঘটছে এ সম্বন্ধে তারা (কুফাবাসীরা) কোনো সংবাদই তখনো জানতো না। ইমাম হোসাইন (আ.) বাইয়াত করতে অস্বীকার করার পর যখন মক্কায় এসে প্রবেশ করেন তার অনেক পরে কুফাবাসীরা এ সংবাদ নতে পায়। তারপরেই তারা ইমাম হোসাইনকে

(আ.) সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প পাঠায়। তাদের সমস্ত প মক্কায় থাকাকালীন সময়েই ইমাম হোসাইনের (আ.) হাতে পৌঁছে।

অপরদিকে ইমাম হোসাইন (আ.) মদীনা ছেড়ে মক্কায় এসেছিলেন দুটো কারেণঃ

প্রথমতঃ মক্কায় আল্লাহর ঘর অবস্থিত। শত্রুমি নির্বিশেষে সবাই মক্কার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাই ইমাম হোসাইন (আ.) অধিকতর নিরাপত্তার জন্যে মক্কাকেই বেছে নিলেন।

দ্বিতীয়তঃ মক্কা ছিল দেশ- বিদেশের অসং মুসলমানের সমাগমস্থল। আর বিশেষ করে তখন ছিল রজব মাস। রজব ও শাবান এ 'মাসমূহল ওমরাহর মাস। তাছাড়া আরও কি দিন পরে রু হবে হজ্বের সমাগম। তাই ইমাম হোসাইন (আ.) মা ষের মধ্যে সত্য ইসলাম প্রচারের জন্যে এটাকে অত অল্প সময় বলে গণ্য করলেন।

কুফাবাসীদের চিঠি আসে ইমামের মক্কা নিবাসের দু'মাস অতিক্রান্ত হবার পর। অথচ এর মধ্যে কতকিছূ ঘটে গেছে। বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে ইয়াযিদী গুপ্তচররা তাকে খুজে ফিরছিল। তাই, কুফাবাসীদের দাওয়াতই যে ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনে মূল অ প্রেরণা যুগিয়েছিল একথা কোন ক্রমেই ঠিক নয়। এটা বড়জোর একটা উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ইতিহাসের বিচারে বলা যায় যে, ঐ তীব্র চাপের সময় কুফাবাসীদের সাহায্যের আশ্বাস ইমাম হোসাইনের (আ.) জন্যে কিছুটা অ কূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল মা ।

কুফা ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের বৃহত্তর প্রদেশগুলোর অন্যতম। হযরত ওমরের সময় স্থাপিত এ নগরী ছিল মূলতঃ মুসলিম বাহিনীরই নিবাস। তাই সামিরক দিক দিয়ে এ নগরীর গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। ইসলামী ভূ- খণ্ডের ভাগ্য নির্ধারণে এ নগরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। তাই, সেদিন কুফাবাসীরা যদি ইমাম হোসাইনের (আ.) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করতো তাহলে হয়তো তিনি সশস্ত্র যুদ্ধেও জয়লাভ করতে পারতেন।

তখনকার কুফার সাথে মক্কা- মদীনার তুলনাই হতো না। এমন কি খোরাসানেরও না। কুফার মোকাবিলায় কেবল শামই ছিল শক্তিশালী । তাই কুফাবাসীদের দাওয়াত ইমামকে কেবল মক্কা ছেড়ে কুফায় যেতেই উদ্বুদ্ধ করে। অবশ্য মক্কাতেও কিছু সমস্যা ছিল। এ কারণে ইমাম হোসাইন

(আ.) কুফাকেই মক্কার চেয়ে বেশী অ কূল মনে করেন। মোট কথা কুফাবাসীদের দাওয়াত যেটুকু করতে পেরেছিল তাহলো ইমাম হোসাইন (আ.) মক্কার বদলে কুফাকেই তার আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিলেন। কিন্তু এর বেশী কোনো অবদান এ প্রসঙ্গে ছিল না।

ইমাম হোসাইন (আ.) মক্কা ছেড়ে কুফায় রওয়ানা হলেন। কুফার সীমান্তে এসে তিনি হুরের বাহিনী দ্বারা বাধাগ্রস্থ হন। তিনি কুফাবাসীদেরকে বললেনঃ 'তোমরা আমাকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছ। যদি না চাও তাহলে আমাকে ফিরে যেতে দাও।'

এই ফিরে যাবার অর্থ এটা ছিল না যে, তোমরা আমাকে সাহায্য করছো না, তরাং অগত্যা আমি ইয়াযিদের হাতে বাইয়াতই করে ফেলি। কখনই না। তিনি ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে বাঁচাতেই ঘর ছেড়ে পথে নেমেছেন। কুফাবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতা করলেও ইমাম হোসাইন (আ.) তার লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। তিনি এই সীমালংঘনকারী ও স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত না করে ক্ষান্ত হতে পারেন না। তার ওপর অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। যে কোনো মূল্যেই তিনি এ দায়িত্ব পালন করতে চান। এ কারণে কুফাবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতা করলেও ইমাম অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে তার আন্দোলন অব্যাহত রাখতেন।

অবশ্য এটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, কুফাবাসীরা যদি ইমাম হোসাইনকে (আ.) আহবান না করতো তাহলে তিনি মক্কা কিংবা মদীনায়ই থেকে যেতেন। এমন হয়তো নাও করতে পারতেন। কেননা এ উভয় জায়গায়ই ইয়াযিদী গুপ্তচররা ষড়যন্ত্রের জাল বুনে রেখেছিল। ইতিহাস সাক্ষ দেয় যে, সে বছের হজ্বের সময় ইমাম হোসাইন (আ.) কে গুপ্তহত্যা করার জন্যে ইয়াযিদী গুপ্তচররা ইহরামের মধ্যেই অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল। তবে, ইমাম হোসাইন (আ.) তাদের অভিসন্ধি বুঝতে পারেন। নবীর (সা.) সন্তানকে আল্লাহর ঘরে ইবাদতের হালে, ইহরাম বাধা অবস্থায় হত্যা করবে- ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্যে এর চেয়ে অবমাননাকর আর কি হতে পারে? এ কারণে ইমাম হোসাইন (আ.) হজব্রত অসমাপ্ত রেখেই মক্কা ত্যাগ করে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হন। তাছাড়া অসংখ্য হাজীর মধ্যে একটা গুপ্ত হামলায় যদি ইমাম হোসাইন (আ.) নিহত হতেন তাহলে প্রসঙ্গেরক্ত বৃথা যাবার সম্ভাবনাই ছিল বেশী। কেননা পরে প্রচার চালানো হতো যে, ইমাম

হোসাইনের (আ.) সাথে হয়তো কারো কুক্ষিগত মনোমালিণ্য ছিল, সে-ই তাকে হত্যা করে আত্মগোপন করেছে।

ইমাম হোসাইন (আ.) যে এসব দিক সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন একথা তার বিভিন্ন ভাষ্য থেকে পরিস্কার ধরা পড়ে। কুফার পথে জৈনক ব্যক্তি ইমামকে জিজ্ঞেস করলো; 'চলে এলেন যে।' তার একথার অর্থ ছিল যে- মদীনায় আপনি শান্তিতে ছিলেন। সেখানে আপনার নানার মাজার। রাসূলুল্লাহর (সা.) মাজারের পাশে থাকলে কেউই আপনাকে বিরক্ত করতো না। অথবা মক্কায় আল্লাহর ঘরে আশ্রয় নিলেই আপনি নিরাপদে থাকতেন, বেরিয়ে এসে আপনি বরং ভূল করেছেন এবং বিপদ বাড়িয়েছেন।

জবাবে ইমাম বলেন, 'তোমার এ ধারণা ভূল। তুমি জান না যে, আমি যদি কোনো প র গর্ত গিয়েও আশ্রয় নেই তবুও ওরা আমাকে ছাড়বে না। ওদের সাথে আমার যে দ্বন্দ তার কোন সমাধান নেই। আপোষ-রফাও এখানে চলে না। ওরা আমার কাছ থেকে যেটা চায় কখনই তা আমি মেনে নিতে পারিনা আর আমি যেটা চাই সেটা ওদের পক্ষেও মেনে নেয়া অসম্ভব।

হোসাইনী আন্দোলনে সর্বশেষ যে কারণ উপাদান হিসাবে ভূমিকা রেখেছিল তা হলঃ ''আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'' অর্থাৎ 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ।' মদীনা থেকে বের হবার সময়েই তিনি তার এ লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া ছিলেন ইমাম হোসাইনের (আ.) সৎ ভাই। তার একহাত পঙ্গু থাকায় জিহাদ করতে অসমর্থ ছিলেন বলে ইমাম হোসাইনের (আ.) সাথে আসতে পারেনিন। ইমাম হোসাইন (আ.) মদীনাতে একটা অসিয়তনামা লিখে তার হাতে দিয়ে এসেছিলেন। তাতে তিনি লেখেন,

هذا ما اوصى به الحسين بن على اخاه محمدا المعروف بابن الحنيفة

'এটা হল ভাই মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়ার কাছে লেখা হোসাইন ইবনে আলীর (আ.) অসিয়তনামা।'

পরবর্তী কয়েকটি লাইনে ইমাম হোসাইন (আ.) আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসূলের (সা.) রিসালাতের প্রতি সাক্ষ প্রদান করলেন, কারণ ইমাম হোসাইন (আ.) জানতেন যে, তার হত্যার

পর প্রচার করা হবে- ইমাম হোসাইন (আ.) দীন থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই প্রথমেই তিনি দীনের প্রতি তার অবিচল থাকার প্রমাণ রেখে এবার ইয়াযিদের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ এবং আন্দোলনের রহস্য বর্ণনা করলেনঃ

انى ما خرجت اشرا و لا بطرا ولا مفسدا و لا ظالما انّما خرجت لطلب الاصلاح فى امّة جدّى، اريد ان امر بالمعروف و النهى عن المنكر و اسير بسيرة جدّى و ابى على ابن ابى طالب عليه السلام

'আমি যশ বা ক্ষমতার লোভে কিংবা ফেতনা- ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার জন্যে বিদ্রোহ করছি না। আমি আমার নানার উম্মতের মধ্যে সংস্কার করতে চাই, আমি চাই সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতে এবং অসৎকাজে বাধা দিতে। সর্বোপরি, আমার নানা এবং বাবা হযরত আলী (আ.) যে পথে চলেছেন সে পথেই চলতে চাই। দ্রঃ মাকতা)লু খারাযমী ১(১৮৮/

এখানে কিন্তু বাইয়াত প্রসঙ্গেরও কোনো উল্লেখ নেই, আবার কুফাবাসীদের দাওয়াত প্রসঙ্গেরও উল্লেখ নেই। অর্থাৎ, এর মাধ্যমে ইমাম হোসাইন (আ.) বোঝাতে চেয়েছেন যে, উপরোক্ত ই ্য না থাকলেও তিনি ইয়াজিদকে সহ্য করতেন না। দুনিয়ার মা ষ জেনে রাখুক যে, এ হোসাইন ইবনে আলীর (আ.) খ্যাতি অর্জনের কোনো লোভ নেই, ক্ষমতারও কোনো লোভ নেই। বরং তিনি একজন সংস্কারক। যুগ যুগ ধরে ইসলামে যে বিদআতের আচ্ছাদন সৃষ্টি করা হয়েছে- তিনি সে সব আচ্ছাদন ছিন্ন করে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে মুক্ত করতে চান।

الا و انّ الدّعى بن الدّعى قد ركز بين اثنين بين السلّة و الذّلّة، و هيهات منّا الذلّة يا ابى الله ذلك لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهورت.

'অধমের পু আরেক অধম (ইবনে যিয়াদ) আমাকে আত্মসমর্পণ করা নতুবা যুদ্ধের হুমকি দেখাচ্ছে । নতি স্বীকার করা আমাদের কখনোই মানায় না। স্বয়ং আল্লাহ, তার রাসূল (সা.) ও মুমিনরা আমাদের নতি স্বীকারকে ঘৃণা করেন।' (দ্রঃ তুহাফুল উকুলঃ ২৪১(

ইমাম হোসাইনের (আ.) এই মহান ও ঐশী আত্মা তার সমস্ত প্রাণ ও রক্তদমাংসের সাথে একাকার ছিল। হোসাইন (আ.) থেকে তা পৃথক করা আদৌ সম্ভব ছিল না। ইয়াযিদী কমকাণ্ড

মেনে নেয়ার আর বিন্দু মা সহ্য ক্ষমতা ইমাম হোসাইনের (আ.) ছিল না। তাই তিনি এবার আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এবং ইয়াযিদী শক্তির উৎখাত করে ইসলাম এবং মুসলমানের মুক্তি দেয়াই তার এখন চুড়ান্ত লক্ষ্য ধার্য হল।

আন্দোলনের উপাদানগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ

ইতি পূর্বে আমরা হোসাইনী আন্দোলনের অবকাঠামোতে যে তিনটি মূল উপাদান ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াযিদের ক্ষমতা লাভ এবং ইমাম হোসাইনের (আ.) কাছ থেকে বাইয়াত নিতে কঠোর নীতি অবলম্বন হলো সে উপাদানগুলোর একটি । কোনমতেই সে ইমাম হোসাইনকে (আ.) ছেড়ে দিতে রাজী নয়। পক্ষান্তরে, ইমাম হোসাইনও (আ.) ইয়াযিদের মত অযোগ্য লোকেক স্বীকৃতি দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। ফলে এই বিপরীতমুখী নীতি শীঘ্রই সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করে।

দ্বিতীয় উপাদান ছিল কুফাবাসীদের সাহায্যের আশ্বাস। এখানে এসে সবাই একটা জিনিস ভুল করে বসে। কুফাবাসীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে এর সদ্ব্যাবহার করার জন্যেই নাকি ইমাম (আ.) বিদ্রোহ করেছিলেন। আসলে ঘটনা ছিল অন্যরকম। ইমাম হোসাইন (আ.) আন্দোলন রু করার দু'মাস পরে কুফাবাসীরা নিজেদের নেতৃত্বের আসন পুরণের জন্যে ইমামকে (আ.) আহবান করে। তৃতীয় উপাদান ছিল ''আব্দুর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার'' অর্থাৎ ''সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ'' ইসলামের এই রোকনটি বাস্তবায়ন করা। তিনি একাধিকবার তার এ উদ্দেশ্যটি ঘোষণা করেছেন স্বীয় বিভিন্ন ভাষ্যে । আর এ উদ্যেশ্য বয়ান করার সময় তিনি উপরোক্ত দুটি কারণের কোনটাকেই উদ্ধৃত করেননি, বরং ''আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার'' বাস্তবায়নকেই তার আন্দোলনের মূল ভিত্তি এবং কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ক্ষে তিনি একজন সংস্কারক এবং তার ভূমিকা সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মক।

এই তিন উপাদানের সবগুলো গুরুত্বের দিক থেকে সমান নয়। প্রতিটি উপাদানই তার নির্দিষ্ট সীমায় গুরুত্ববহ ছিল এবং সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকেই ভূমিকা রেখেছে। কুফাবাসীদের দাওয়াত ইমাম হোসাইনের (আ.) কাছে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এর ফলে ইমাম হোসাইন (আ.) ধু একটা শক্তিশালী প্রদেশের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ইয়াযিদ বাহিনীর সাথে সশস্ত্র যুদ্ধে নামতে পারতেন এবং এ যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা বড়জোর ৬১ শতাংশ ছিল। কেননা বিশ্বাসঘাতকতা না

করে কুফার সব লোকও যদি ইমাম হোসাইনের (আ.) পাশে দাঁড়াতো তবুও শামের বাহিনীর মোকাবলো করা একবারে সহজ কথা ছিল না। শামের বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। এ কারণে তারা হযরত আলীর (আ.) বাহিনীর সাথে সিফফিনের যুদ্ধে ১৮ মাস যাবত অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাই দেখা যায় যে, কুফাবাসীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি হোসাইনী আন্দোলনে একটা সাধারণ উপাদান ছিল। পক্ষান্তরে, তাদের এ আহবানে সাড়া দেয়াও সাধারণ ব্যাপার। কারণ ঐ ধরনের তীব্র প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এরকম সাহায্যের আশ্বাস পেলে যে কেউই তা গ্রহণ করবে।

অথচ বাইয়াত করতে ইমামের অস্বীকৃতি জানানোর ঘটনা ঘটে আরও নিঃসঙ্গ দিনে। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, দাওয়াত প্রসঙ্গের চেয়ে এ উপাদান ই অধিকতর গুরুত্বের দাবীদার। কেননা ইমাম হোসাইন (আ.) যেদিন বাইয়াত করতে অস্বীকার করেছিলেন সেদিন কেউ ইমামের পাশে ছিল না- আর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেউ তাকে আহবানও করেনি। বরং এক অত্যাচারী শাসকমহল ক্ষমতাসীন। দীর্ঘ বিশবছর ধরে তাদের গোড়াপত্তন হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে সমাজে শাসকগোষ্ঠীর হিংসাত্মক চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মোয়াবিয়া বিশেষ করে তার শাসনামলের শেষার্ধে কি ধরনের হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপ চালায়- ইতিহাস তার জলন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে। সে এমন কি জুমআর নামাজের খুতবায় হযরত আলীকে (আ.) অভিসম্পাত করা আবশ্যিক ঘোষণা করে। এক পর্যায়ে সর্ব এ রীতি চালু হয়ে যায়, এমন কি মক্কা-মদীনায়ও এ ধরনের অভিসম্পাত করা ইবাদত বলে গণ্য হতে থাকে। কেউ এর প্রতিবাদ করলে সাথে সাথে তার গর্দান যেত। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে, হযরত আলীর (আ.) নাম মুখে উচ্চারণ করাও অপরাধ বলে বিবেচিত হত। মোহাদ্দিসগণ হযরত আলীর (আ.) ফযীলত সম্বলিত কোনো হাদীস বর্ণনা করতে সাহস পেতেন না। যদি একান্তই তারা হাদীস বলতে চাইতেন তাহলে তারা নিজেরাই কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে পদা টাঙিয়ে দরজা- জানালা বন্ধ করে আগে সবাই কসম খেয়ে নিতেন এ হাদীস ফাস করবেন না। এভাবে একশত ভাগ নিশ্চিত হয়ে তারপর তারা কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন।

এরকম একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে তাও আবার ইয়াযিদের মতো পাষণ্ডের সামনে 'না' বলা কম বীরত্বের কথা নয়। ইয়াযিদ তার বাইয়াত না নেয়া পর্যন্ত নিরস্ত্র হতে রাজী না; ওদিকে ইমাম হোসাইন (আ.) বলছেন আমাকে খণ্ড বিখন্ড করে ফেললেও তোমাদের কাছে আমি নতি স্বীকার করবো না। তাই তুলনামূলক বিচারে দাওয়াত প্রসঙ্গের চেয়ে বাইয়াত না করার প্রসঙ্গ অবশ্যই অধিকতর গুরুত্বের দাবীদার। কেননা ইমাম হোসাইন (আ.) দুনিয়ার জন্যে ঈমান- আকীদা ও ঐশী দায়িত্ব কে কোন ক্রমেই বিকিয়ে দিতে পারেন না। আর এ চেতনা নিয়েই তিনি তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। উমাইয়ারা টাকা দিয়ে ইতিহাস রচনা করতো। এমন কি বাইতুলমালের টাকা খরচ করে দরবারী আলমদের ভাড়া করে রাসূলের (সা.) অসংখ্য হাদীস জাল করতেও পিছপা হয়নি। ইসলামের ইতিহাসকে তারা মনগড়া ইতিহাসে পরিণত করে। যেটুকু অক্ষত রয়ে গেছে সেটুকু কেবল ইমাম হোসাইনের (আ.) রক্তের বদৌলতেই সম্ভব হয়েছে। কেননা ইমাম হোসাইনও (আ.) যদি সেদিন ইয়াযিদের হতে বাইয়াত করে চুপচাপ সবকিছু সহ্য করে যেতেন তাহলে ইসলামকে বাতিল থেকে পৃথক করাই অসম্ভব হয়ে পড়তো। তরাং বাইয়াত না করার প্রসঙ্গ হোসাইনী আন্দোলনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এবার তৃতীয় উপাদান অর্থাৎ 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার' নিয়ে আমরা একটু সবিস্তার আলোচনা করবো। ইমাম হোসাইন (আ.) কোরআন ও হাদীসের একাধিক উদ্ধৃতি সহকারে অন্য কোনো প্রসঙ্গকে না জড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই তার এ লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার বলোয় ইমাম হোসাইন (আ.) তার পূর্বেকার আত্মরক্ষামূলক নীতি ছেড়ে আক্রমণাত্মক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এখানে এসে তিনি একজন ইতিবাচক বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব । এখানে বাইয়াত প্রসঙ্গের কোনো অ গমন নেই কিংবা দাওয়াত প্রসঙ্গেরও কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ যদি তার কাছে বাইয়াত না- ও চাওয়া হতো অথবা কুফাবাসীদের সাহায্যের আশ্বাস তিনি না- ও পেতেন, তবুও তিনি একাকী এই অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন। সমাজ পঙ্কিলতায় ভরে গেছে, খোদার হারামকে হালাল এবং হালালকে হারামে

পরিবর্তন করা হয়েছে। মুসলমানদের বাইতুলমাল আল্লাহর পথে খরচ না করে তা লুটে পুটে খাওয়া হচ্ছে । এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা.) উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বললেনঃ .

فلم يغيّر بفعل او قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله

‘‘এ ধরনের অবনতি দেখেও যারা এর উৎখাত করতে পা বাড়ায় না, কথা কিংবা কাজের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করে না সেক্ষে নাস্তিক- তাগুতীদের সাথে সে সব লোককেও জাহান্নামে পাঠানো আল্লাহর বিধানের অন্তর্গত।’’ এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা.) হাদীসের উদ্ধৃতি টেনে ইমাম হোসাইন (আ.) প্রমাণ করলেন যে, এটাই সেই বিদ্রোহের সময়- এই সেই প্রতিবাদের সময়। তরাং আজ যদি কেউ চুপ করে বসে থাকে তাহলে তার পরিণতি অবশ্যই ঐ সমস্ত পাপিষ্টদের মতোই হবে। এ ধরনের একাধিক হাদীস থেকে ইমাম হোসাইন (আ.) তার আন্দোলনের ধারা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন।

ইমাম রেযা (আ.) থেকে এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন :

اذا تواكلت الناس الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله

‘যখন লোকেরা অন্যের কাধে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’ করা থেকে বিরত থাকে এবং পরিণামে কেউই যদি এ কাজে অগ্রসর না হয়- তাহলে তারা যেন আল্লাহর আযাবের অপেক্ষায় থাকে।’ (দ্রঃ ফুরুয়ে কাফী ৫(৫৯/

প্রশ্ন হতে পারেঃ এ আযাব কি ধরনের? তাদের কি আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ করে মারা হবে?

জবাব হলঃ না। স্বয়ং আল্লাহপাক পবি কুরআনে আযাবের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

(قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ)

‘‘বল, তিনি তোমাদের ওপর থেকে অথবা পায়ের নীচ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম।’’ (দ্রঃ সূরা আনআমঃ ৬৫(

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ তোমাদের ওপর থেকে অর্থাৎ তোমাদের চেয়ে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী মহল থেকে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, আর পায়ের নীচ থেকে বলতে বোঝানো হয়েছে, তোমাদের চেয়ে দুর্বল মহল থেকেও তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যারা আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার করা থেকে বিরত থাকে তারা যেন আল্লাহর নিশ্চিত শাস্তির অপেক্ষায় থাকে।

অন্য আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

لتآمرون بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر او يسلطنّ الله عليكم شرار كم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم

''অবশ্যই সৎ কাজের উপদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা দান করবে নতুবা অধমরাই তোমাদের কাধে চেপে বসবে। এটা যদি বর্জন করা হয় তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন তোমরা যতই অ নয়- বিনয় করো না কেন- তা গ্রাহ করা হবে না।'' (দ্রঃ ফুরুয়ে কাফীঃ ৪/৫৬)

ইমাম গাযযালীও (রহঃ) তার বিখ্যাত 'এহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করার সময় অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই বলে থাকেন যে, অধমদের ক্ষমতাসীন হবার যোগ দিলে উত্তমরা আল্লাহর দরবারে যতই অ নয়- বিনয় করুক না কেন তা গ্রাহ্য হবে না। অর্থাৎ যে সমাজে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার বর্জিত হয় সে সমাজ আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত হয়। তখন কেদে বুক ভাসালেও আল্লাহ তাদের প্রতি সহায় হবেন না। অথচ ইমাম গাযযালী (রহঃ) এ হাদীসটির একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা সত্যিই চমৎকার। তিনি বলেন :

فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم

এই অংশটুকুর অর্থ যে, তারা আল্লাহর কাছে অ নয়- বিনয় করে প্রত্যাখ্যাত হবে তা নয়, বরং এর অর্থ হল : ''সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ'' পরিত্যাগ করলে অধমরা এতটাই দুর্দান্ত, পাষণ্ড বেশরম ও প্রতাপশালী হয়ে উঠবে যে, ভাল লোকরা নিরূপায় হয়ে তাদের কাছে কোনো প্রত্যাশা করলে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান ও লাঞ্ছিত করা হবে। তাই এ হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা.) উম্মতকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন : তোমরা যদি মাথা উচু করে বাচতে চাও

তাহলে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার করো নতুবা তোমরা হীন-দুর্বল ও অপমানিত হবে। নিকৃষ্টতম লোকও তখন তোমাদেরকে আর গুরুত্ব দেবে না। এমন কি দাস-দাসীদের মতোও যদি তখন তোমরা তাদের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াও তবুও তোমাদেরকে গ্রহণ করা হবে না।

হাদীসটির এই ব্যাখ্যাটা অত্যধিক গুরুত্ববহ। ইসলামে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রোকন রয়েছে বলেই ইমাম হোসাইন (আ.) এটাকে তার স্লোগান হিসেব বেছে নেন। তিনি ইসলামের এই সূক্ষ্ম দর্শন সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন বলেই তার বিভিন্ন ভাষ্যে বোঝাতে চেয়েছেনঃ ইয়াযিদ যদি বাইয়াত নেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি না- ও করতো কিংবা কুফাবাসীরা যদি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না- ও দিতে, তবুও আমি কেবল অধমদের হাত থেকে মানবতাকে বাচানোর জন্যেই বিদ্রোহ করতাম।

ইসলামের বিভিন্ন ভিত্তির মধ্যে 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার'ও একটি । এই ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিতভাবে পরিচিত হবার অবকাশ রয়ে গেছে। কেননা রাসূলুল্লাহর (সা.) একাধিক হাদীসে এ বিষয় বেশ গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের ফেকাহ শাস্ত্রে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচিত হয়েছে। উপরন্তু খোদ কোরআন মজীদেও এ বিষয়টি বিস্তর গুরুত্ব সহকারে বারংবার উল্লিখিত হয়েছে এবং এ রোকনটি থেকে গাফেল থাকার কারণে অতীতের কত জাতিই যে সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেটাও কুরআনে আলোচিত হয়েছেঃ

(فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ)

''তোমাদের পূর্ববর্তী বংশধরদের মধ্যে কোনো একদল সজ্জন ছিল না যারা ফ্যাসাদের সাথে সংগ্রাম করে তাদের সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাচাতো? (সূরা হুদ১১৬ -)

''সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ'' পরিত্যাগ করার দায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত আরেকটি জাতি সম্পর্কে পবি কোরআন বলছেঃ

(كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)

‘‘তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একেঅপরকে বাধা দিত না। তারা যা করতো তা কতই না নিকৃষ্ট !’’ (মায়িদা ৭৯ :)

আর মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে পবি কোরআন বলছেঃ

(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

‘‘তোমাদের সেই উম্মত হওয়া চাই যারা সৎ কাজে আদেশ করে এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়। যে উম্মতের মধ্যে এই গুণ আছে তারাই তো সফলকাম।’’ (আল(১০৪ : ইমরান -

সূরা আলে ইমরানে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার সংক্রান্ত অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতটির আগে বলা হয়েছেঃ

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেও না।’’ (আল : ইমরান - (১০৩

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহবান জানানো হয়েছে। কারণ মুসলমানরা যদি ভিন্ন ভিন্ন ফেরকা নিয়ে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিপ্ত হয় তাহলে এ থেকে সবচেয়ে বেশী ফায়দা লুটবে ইসলামের শত্রুরা। তাই বৃহত্তর স্বার্থে মুসলমানদের মধ্যকার ভেদাভেদগুলো ভুলে গিয়ে আল্লাহর রজ্জুতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। এই ঐক্যের আহবান জানানোর পরের আয়াতেই কোরআন বলছেঃ

(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

তোমাদের মধ্যে এমন কারো থাকা চাই যারা সৎ কাজের প্রতি আহবান করবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সৎ কাজ বলতে এখানে ঐক্য রক্ষার কথাই বলা হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে একদল সজ্জন থাকা চাই যারা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে, মুসলমানদের ঐক্য কে অটুট রাখবে। পরবর্তী আয়াতে কোরআন বলেছে :

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا).

‘‘তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা নিজেদের মধ্যে বিভেদ করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে।’’ (আল ইমরান (১০৫ :

এখানে যে বিষয় অতীব লক্ষ্যণীয় তা হলো যে, যেখানে পর পর দুটি আয়াতে ঐক্যের আহবান জানাতে বলা হয়েছে এবং বিভেদ করতে নিষেধ করা হয়েছে সে দুটি আয়াতের মাঝখানে বলা হচ্ছেঃ

(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

‘‘তোমরা এমন উম্মত হও যারা সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়- এ গুণ সমৃদ্ধ জাতিই হল ধন্য জাতি’’ আয়াতের এ ধরনের বিন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য রক্ষাকেই কোরআন অন্যতম সৎ কাজ বলে মনে করে এবং- বিভেদ এবং হানাহানিকে ন্যাক্কারজনক কাজ বলে বিবেচনা করে- এ বিভেদের কারণ যেটাই হোক না কেন।

আরও একধাপ পরে এসে কোরআন বলছেঃ

(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)

‘‘হে মুসলমানগণ! তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমরাই মানব জাতির জন্যে নি:সারিত হয়েছো অর্থাৎ মানবতার স্বার্থরক্ষায় তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উম্মত আর কেউ এ পৃথিবীতে আসেনি।’’

এখন প্রশ্ন হল, কোরআনের অ সারীদের এই শ্রেষ্ঠত্বের জবাবে এবার কোরআন বলছেঃ

(تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)

‘‘তোমাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল তোমরা সৎ কাজে আদেশ দান কর এবং অসৎ কাজে বাধা দাও।’’ (আল১১০ ইমরানঃ -)

কোরআনের এই বিধান অ যায়ী বলা যায় যে, আজ আমাদের যে মুসলিম সমাজে ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’ নেই সে মুসলিম সমাজ নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে দাবি করতে পারে না। ধু তাই নয়, যেহেতু ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিটি তাদের জীবনে প্রচলিত নয়, তাই তাদের ইসলামও অসম্পূর্ণ। আমরা যদি কোরআন ও ন্নাহর আলোকে এ বিষয়

বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো যে, অসংখ্য আয়াত ও হাদিস মূলতঃ ‘আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকার’- এর অসামান্য গুরুত্বের কথাই তুলে ধরেছে।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজ বিভিন্ন অজুহাতে আমাদের ফেকাহশাস্ত্রে এটাকে সবচেয়ে ছোট অধ্যায়ে সংকলিত করা হয়েছে। ফলে আজকের মুসলিম সমাজে এর গুরুত্ব লোপ পেতে বসেছে। প্রকৃতপক্ষে ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’ এমন কোনো বিষয় নয় যা কালক্রমে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। কেননা জুলুম অত্যাচার বরাবরই ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আর কোরআনের কথামতো শ্রেষ্ঠ উম্মত তারাই যারা এসব জুলুম ও ফ্যাসাদের সাথে সংগ্রাম করবে। এজন্যে সব কিছুর অগ্রে ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারকে’ টিকিয়ে রাখতে হবে সব সময়।

পাশ্চাত্যের ORIENTALIST-দের অনেকেই ইসলামকে রীতিমত এই বলে অপবাদ দিয়ে থাকে যে,ইসলাম সম্পূর্ণ একটা ভাগ্যনির্ভর দীন। এতে মা ষের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং মা ষকে বলা হয়েছেঃ তোমরা হাত- পা গুটিয়ে কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকো। দেখ আল্লাহ কি করে। তারা আরও অপবাদ দেয় যে,ইসলাম মা ষকে কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে,অর্থাৎ ইসলামে মা ষের কোনো কিছু করার নেই। যা কিছু করার সবই আল্লাহ করবেন। এ ব্যাপারে মা ষের কোনো দায়িত্ব ও নেই।

এটা স্রেফ একটি অপবাদ। ঘটনাক্রমে কোরআন স্বয়ং ইহুদীদেরকেই এই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। যখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বলেন :

(يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ)

‘‘হে আমার উম্মত, আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে ভুখণ্ড নির্দিষ্ট করেছেন সেখানে চলো।’’

তখন তারা মূসাকে (আ.) বললো :

(فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ)

‘‘হে মূসা (আ.)! আমরা এখানেই বসে থাকি, আপনি ও আপনার খোদা গিয়ে যুদ্ধ করুন এবং শত্রুকে তাড়িয়ে দিয়ে ভূখণ্ড খালি করে ফেলুন। তারপর আমরা আসছি।’’

বদেরের যুদ্ধের সময় (যখন কাফেলা পালিয়ে গিয়েছিল) রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের নিয়ে আলোচনায় বসেন ও সবার মতামত জানতে চান। তিনি বলেন, তোমরা বলো দেখি, এখন আমরা শত্রুদের খোজে বের হবো নাকি মদীনায় ফিরে যাব? সবাই যার যার মত পেশ করলেন, কিন্তু আবুজর কিংবা মেকদাদ এই দু'জনের একজন বললেনঃ হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমরা তো আর বনী ইসরাইলের মতো বলবো না, আমাদের কোনো কিছু করার নেই; আপনি আর আপনার খোদা গিয়ে যুদ্ধ করুন। বরং আপনি যা বলবেন আমরা তাই নবো। তাছাড়া একমা পবি কোরআনই পরিস্কারভাবে মা ষের স্বাধীনতা ও তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে ফরিয়াদ করে বলছেঃ

(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا)

''আমরা তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন তাদের ইচ্ছা হয় শোকর গুজার হবে আর নতুবা কুফরী করবে''। ৩ দাহরঃ))

(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)

''আমি কি তাকে দু'টি পথই দেখাই নি?''

(وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا)

''যারা মুমিন হয়ে পরকাল কামনা করে এবং তজ্জন্যে যথাযথ প্রচেষ্টা চালায় তাদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।'' (ইসরাঃ ১৯(

এছাড়া কুরআনে বহু আয়াতে বলা হয়েছেঃ

(فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ)

''তোমরা নিজের হাতে যা অর্জন করেছো।'' (রাঃ ৩০(

যাতে আমরা অন্যায় ও অবৈধ কাজকর্মকে আল্লাহর কাধে না চাপাই। যদি কোনো সমাজ, কোনো জাতি হতভাগ্য, অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে তা তাদের নিজের দোষেই হয়েছে। কোরআন বলছেঃ

(مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

‘‘আমরা কখনোই তাদের ওপর জুলুম করিনি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করতো।’’ (নাহলঃ ১১৮(

আর একটি বিষয় যা পশ্চিমাদের এই অপবাদকে খণ্ডন করে এবং যা কেবল ইসলামেই রয়েছে ও অন্যরা তা থেকে বঞ্চিত, তা হলো যে, ইসলাম মা ষকে কেবল আল্লাহর সম্মুখেই দায়িত্বশীল করে ক্ষান্ত হয়নি, মা ষের নিজেদের মধ্যেও একজনকে অন্যের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যভার অর্পণ করেছে। ‘আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকার’ হল এটাই : হে মা ষ, তুমি কেবল আল্লাহর সম্মুখেই দায়িত্বশীল নও, সমাজের সামনেও তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলঃ এরকম একটা দীন কি কখনো নিছক ভাগ্য নির্ভর দীন হতে পারে? বরং ভাগ্য (কাযা ও কাদার) নির্ভর দীন বলতে ওরা যে অর্থ বুঝিয়েছে অর্থাৎ ইসলাম মা ষকে কোনো রকম স্বাধীনতা, কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে বঞ্চিত করেছে’’- ইসলাম এই ধরনের ‘‘কাযা কাদার’’কে খণ্ডন করেছে। ইসলাম মা ষকে যে স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব দিয়েছে, তার দলিল হিসেবে এই ছোট আয়াতটিই যথেষ্ট । পবি কোরআন সূরা রা’দের ১১ নং আয়াতে বলছেঃ

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)

‘‘আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে অগ্রসর হয়।’’ এর চেয়ে বেশী স্বাধীনতা, কর্তৃত্ব আর কি হতে পারে?

পক্ষান্তরে, মুসলমানদের মধ্যেও যারা সবকিছু আল্লাহ করবে এই আশায় হাত -পা গুটিয়ে বসে থাকে, এই আয়াতের চপেটাঘাত তাদের মুখেও লাগে। তাদেরকে ধমক দিয়ে এই আয়াতটি বলেঃ অনর্থক বসে থেকো না, আল্লাহ অনিবার্যভাবে কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করবেন না।

حتى يغيّروا ما بانفسهم যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে এগিয়ে আসবে, তাদের যা করার তা ভালভাবে সম্পাদন করবে। তাদের চরি , মানসিকতা, লক্ষ্য এবং সর্বোপরি তারা নিজেরা দ্ধ হবে। এর চেয়ে গুরুদায়িত্ব আর কি হতে পারে? তাও আবার একটা সমাজ তথা গোটা জাতির ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

আরেকটি আয়াতে পবি কোরআন একটা কলূষিত জাতির পরিণতি তুলে ধরে বলছেঃ

(ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)

আল্লাহ কোনো জাতির জন্যে যে নেয়ামত দান করেছেন তা তিনি ফিরিয়ে নেন না যতক্ষণ তারা নিজেরাই তা বর্জন করে।'' (আনফালঃ ৫৩(

অর্থাৎ যখন কোনো জাতি কলূষতায় নিমজ্জিত হয়, ফেতনা- ফ্যাসাদে ভরে যায়, তাদের সমাজ এভাবে তাদের নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়, তখনই আল্লাহও তাদেরকে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন।

এরপর কি বুঝতে বাকী থাকে যে, আমরা যারা সব কাজ আল্লাহ করবেন ধু এই আশায় বসে আছি তাদের এ আশা একবারেই অনর্থক ও ভিত্তিহীন।

যতক্ষণ কোনো জাতি নিজেরাই নিজেদের দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে এগিয়ে আসবে না, যতক্ষণ কোনো জাতি পরিশ্রমী ও ত্যাগী হবে না, যতক্ষণ কোনো মুক্ত - স্বাধীন চিন্তার পথ ধরবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে জাতি উন্নত হবে না, মুক্তি পাবে না।

পক্ষান্তরে যখন কোনো জাতি তাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে উঠে পড়ে লাগবে, পরিশ্রম করবে, কল্যাণের রাস্তা বেছে নিতে পারবে একমা সে জাতিই আল্লাহর সমর্থন লাভ করবে। পবি কোরআনের ভাষায় তারা আল্লাহর ফায়েজ, রহমত ও সহযোগিতার অধিকারী হবে। যদি অন্যের ওপর ভরসা করে নিস্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে থাকলে সমস্যার সমাধান হতো তাহলে ঐ পরিস্থিতিতে হযরত ইমাম হোসাইনও (আ.) সবার আগে তাই করতেন। কিন্তু কেন তা তিনি করেননি? কারণ তিনি নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি সমাজকে কলূষমুক্ত করতে চেয়েছিলেন যে কলূষতায় একই পরিণতি ভোগ করতে হবে।

কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) কিভাবে সমাজকে কলুষতা মুক্ত করবেন? কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন? সোজা কাজতো আমরাও করতে পারি। সাধারণ পর্যায়ের সমস্যা সমাধান করা সবার পক্ষে সম্ভব। ইসলাম বলেছেঃ কেউ মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হও, কোরআন খানিতে অংশ নাও। সবাই এসব কাজ করেও থাকে। কিন্তু ইসলাম সব সময় এ ধরনের সাধারণ কাজ চায়

না। কখনো কখনো ইমাম হোসাইনের (আ.) মত পদক্ষেপ নিতে হয়, বিদ্রোহ করতে হয়। এমন কিছু করতে হয় যা কেবল ঐ সময়ের মুসলিম সমাজকেই ঝাকুনি দেবে না, বরং এক বছর পর তা এক রকমভাবে, পাঁচ বছর পর আরেকটি রকমভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। এমন কি ৫০ বছর-১০০ বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা সত্যের পথে সংগ্রামকারীদের জন্যে এক আদর্শ হিসেবেই চিরজাগরুক থাকবে। আর এটিই হলো নিজেদের ভাগ্যে নিজেরাই পরিবর্তন আনা।

আলেম সমাজের দৃষ্টিতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনে 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের' উপস্থিতি এই আন্দোলনকে যেমন একটা মহান আদর্শে পরিণত করেছে ঠিক তেমনিভাবে এ আন্দোলন, 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার'কে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলেছে। ইসলামের এই রোকন ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনকে ধু ইসলামী বিপ্লবের শীর্ষেই আসন দান করেনি, বরং যুগ যুগ ধরে বিপ্লবী মুসলমানদের জন্যে অ করণীয় আদর্শে রুপান্তরিত করেছে। তেমনিভাবে হোসাইনী আন্দোলনও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে ইসলামের মূল ভিত্তি গুলোর প্রথম সারিতে স্থান করে দিয়েছে।

এখানে হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এটা কীভাবে সম্ভব? ইমাম হোসাইন (আ.) আবার ইসলামের কোনো রোকন বা ভিত্তিকে গুরুত্ববহ কিংবা গুরুত্বহীন করে দিতে পারেন নাকি?

উত্তরে বলতে হয় যে উপরোক্ত বক্তব্যে আমরা এ রকম কিছু বলতে চাইনি। কেননা ইসলামের কোন রোকন বা ভিত্তিকে গুরুত্ববহ কিংবা গুরুত্বহীন করার কাজ ইমাম হোসাইনের (আ.) নয়- স্বয়ং রাসূলুল্লাহরও (সা.) নয়। এটা একমা আল্লাহর কাজ। মহান আল্লাহ তার দীনকে যে সব ভিত্তি র উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেগুলোর প্রত্যেকটির একটি নির্দিষ্ট মা ায় গুরুত্ব ও মূল্য রয়েছে এবং এ গুরুত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে। বরং উপরের বক্তব্যে যেটা বলতে চেয়েছি তা হলঃ হোসাইনী আন্দোলনের পর আলেম সমাজ তথা সমগ্র মুসলিম সমাজই 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার' সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা এবং এর সঠিক গুরুত্ব নিরূপণ করার প্রয়োজনীয়তা অ ভব করেন। ব্যাপারটা আরও একটু ব্যাখ্যা করলে ভাল হবে। প্রতিটি জিনিসের দুটো অবস্থান রয়েছেঃ

এক : ঐ বস্তুর সত্বাগত বা প্রকৃত অবস্থান।

দুই : পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থান।

মনে করুন একটি শহরে কয়েক জন ডাক্তার আছে। এদর মধ্যে সবাই কিন্তু একমানের নয়। কেউ হয়তো সত্যিই দক্ষ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারর। আবার কেউ হয়তো এখনো এ পেশায় একবারে নতুন এবং কাচা। ডাক্তারদের মধ্যকার এই গুণ ও মানগত পার্থক্য একমা ডাক্তাররাই বুঝতে পারেন। সাধারণ মা ষের কাছে এই গুণ ও মান তেমন বিচার্য়যর বিষয় নয় এবং তা নির্ণয় করাও তাদের পক্ষে সহজ কাজ নয়। তাদের চোখে সবাই ডাক্তার, সবাই সমান। কখনো কখনো দেখা যায়, ধু যে ডাক্তারের প্রচারের জোর যত বেশী, যার কথা জনগণের কানে বেশী বেজেছে, সত্যিকার অর্থে সে যদি একজন তৃতীয় শ্রেণীর ডাক্তারও হয় তবু জনগণ তাকেই বড় ডাক্তার বলে মনে করে। অথচ হয়তো কত প্রথম শ্রেণীর দক্ষ ডাক্তার রয়েছেন যাদের প্রচারের জোর নেই। জনগণের কাছে তারা একান্তই অবহেলিত।

এ উদাহরণে আমরা দেখতে পেলাম যে, একজন ডাক্তার সত্যিকার অর্থেই একজন অভিজ্ঞ এবং ঝা ডাক্তার হয়েও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়ে তিনি অবহেলিত এবং অপরিচিত ডাক্তার হিসেবে পরিগণিত হলেন।

ইসলামেও তেমনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রোকন রয়েছে। ইসলামে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি রোকনগুলোর মত ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি । কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে, নামায রোযা আর হজ্ব এগুলো নিয়ে মুসলমানরা মশগুল হয়ে পড়েছে। ক্রমে ক্রমে ইসলামের অন্য ভিত্তি গুলো একবারে ভুলেই গিয়েছে। অথচ নামায কিংবা রোযার মত ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’- এর গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। একমা বিজ্ঞ ব্যাক্তিরাই বুঝতে পারেন যে, ইসলামের এই ভিত্তি গুলোর প্রতিটিই কত গুরুত্বপূর্ণ।

তরাং আমরা যে বললাম, ইমাম হোসাইন (আ.) ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নহী আনীল মুনকার’কে উন্নীত করেছেন - একথার অর্থ হলো ইমাম ইসলামের এই ভিত্তিকে ইসলামী বিশ্বে উন্নীত করেছেন, খোদ ইসলামে নয়। খোদ ইসলামের কোনো কিছু যোগ- বিয়োগ করার কাজ একমা আল্লাহর।

মহান আল্লাহ দীন ইসলামের প্রতিটি ভিত্তি কে নির্দিষ্ট মা ায় গুরুত্ব ও দিয়েই প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মুসলিম সমাজ কি ইসলামের এই ভিত্তিগুলোর প্রত্যেকটির যে প্রকৃত মূল্য আল্লাহ দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই মূল্যায়ন করে? হয়তো ঐরকম নাও করতে পারে। ধু তাই নয়। কখনো কখনো হয়তো যেমন আছে তার উল্টোটাই ধরে নেয়। ইসলামে যে ভিত্তি প্রথম শ্রেণীর মূল্যবহ তাকে হয়তো তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলতে পারে আর তৃতীয় শ্রেণীর কোনো ভিত্তি কে প্রথম শ্রেণীতে নিয়ে আসতে পারে।

ইসলামের ভিত্তি গুলো যদি উল্টো পাল্টা হয়ে যায়, তবে ইসলাম তখন উপহাসের পা পরিণত হবে। শ্রেষ্ঠধর্মের মর্যাদা হারাবে। যেমন ধরুন চুল এবং দাঁড়ি আচড়ানো ন্নত। কিন্তু এটা যদি 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার'- এর চেয়ে বেশী গুরুত্ব ও মূল্য লাভ করে তাহলে এটাও ইসলামের নামে একটি বিচ্যুতির কারণ। সামান্য চুল ও দাঁড়ি আচড়ানোর গুরুত্ব 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার'- এর মতো ইসলামের একটা ভিত্তির চেয়ে কোন ক্রমেই বেশী হতে পারে না।

মুসলমানদের কাছে 'আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকার' বিভিন্ন আঙ্গিকে মূল্যায়িত হয়েছে। এ ব্যাপারে আলেম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এক আলোচনা করা যাক। যদিও আলেম সমাজ এই ভিত্তিটির শিরোনামে এ সম্পর্কে কোনো পর্যালোচনা করেননি। তবে তাদের পর্যালোচনায় এই ভিত্তিটি স্থান পেয়েছে এবং এ থেকে এ ভিত্তিটির মূল্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অ ধাবন করা যায়। ইসলামের একটি মূলনীতি রাসূলুল্লাহর (সা.) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যার উপর নির্ভর করে সবাই নিজ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন। হাদীসটি হলোঃ

اذا اجتمعت حرمتان تركت الصغرى للكبرى

''যদি দুটো পরস্পর বিরোধী হারাম একই সাথে উপস্থিত হয়, তাহলে বড়টা পালন করার জন্যে ছোটটা পরিত্যাজ্য ।''

এ বক্তব্যের বহু উদাহরণ রয়েছে। তবে সচরাচর যে উদাহরণটি পেশ করা হয় তাহলো জবরদখলকৃত জমিতে প্রবেশ করা হারাম। এখন যদি দেখেন যে, এরকম একটা জমির পুকুরে

একটা লোক ডুবে যাচ্ছে তাহলে আপনি কি করবেন? এ জমিতে ঢোকা যেমন হারাম তেমনি প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে না যাওয়াও হারাম। আপনি তখন এ জমিতে ঢুকে (যা হারাম) ঐ লোকটার প্রাণ বাঁচাবেন আর নয়তো এখানে ঢোকা যাবে না বলে চুপ করে দাড়িয়ে দাড়িয়ে লোকটির মৃত্যুরবরণ উপভোগ করবেন? এখানে আপনি কি করবেন? জমিতে ঢোকা কিংবা তার প্রাণ না বাচানো দুটোইতো হারাম কাজ?

এখানে আপনার করণীয় হবে জমিতে ঢুকে লোকটার প্রাণ বাঁচানো। জবরদখলকৃত জিনিষে পা মাড়ানোর অপরাধের চেয়ে একটা প্রাণ বাচানো অনেক মূল্যবান। তাই এ মুহুর্তে যদি আপনি ঐ জমিতে প্রবেশ করেন তাহলে আপনার কোনো পাপ তো হবেই না, উপরন্তু আপনি সওয়াবের অধিকারী হবেন।

'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার'- এর ক্ষে ও ইসলামের এই নীতি প্রযোজ্য । আমরা যে 'আমর বিল মারুফ কিংবা নাহী আনীল মুনকার' করবো- এ ক্ষে কতদুর পর্যন্ত এগুতে পারবো? কখনো কখনো 'আমর বিল মারুফ কিংবা নাহী আনীল মুনকার' করলে আমাদের জানমালের, মান- সন্মানের ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা থাকে না- এ রকম ক্ষে সবাই রাজী। আর কেউ যদি এ ও না করে তাহলে সে নিতান্ত অলসতার পরিচয় দেবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, কাউকে সৎকাজের আদেশ করলে কিংবা অসৎকাজ থেকে বাধা দিলে নিজের জানমাল ও মান- ইজ্জতের হানি হতে পারে তাহলে এ ক্ষে করণীয় কি? এরূপ অবস্থায়ও কি 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার' করা যাবে?

যদি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দিলে আমার নিজের প্রাণহানির পাশাপাশি আমার পরিবার- পরিজনদেরকে বন্দী করা হয়, প্রিয় সন্তান এবং সহযোগীদেরকে হত্যা করা হয় তাহলেও কি তা করা যাবে?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আলেম সমাজ ভিন্ন ভিন্ন মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকে মনে করেন, 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের' সীমানা ততদুর পর্যন্ত যতক্ষণ না জানমাল, ইজ্জত- সম্মান হুমকির মুখে পড়ে। এই মত প্রকৃতপক্ষে 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী

আনীল মুনকার'কে তার প্রকৃত অবস্থান থেকে নামিয়ে এনেছে। তারা বলে যে যদি 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারে' জানমালের প্রশ্ন একই সাথে আসে তাহলে 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারকে' পরিত্যাগ করে তোমরা জানমালের হেফাযত কর, তোমাদের ইজ্জত বাঁচাও।

অবশ্য তাদের বক্তব্য বেঠিক নয়। কেননা, মুমিনের জানমাল এবং ইজ্জতের মূল্য আছে। বিনা কারণে আপনার শরীরে একটা ছোট জখম করারও অধিকার আপনার নেই। আর প্রাণের জন্যে হুমকি সৃষ্টি করা তো আদৌ উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং কোরআন বলছেঃ

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)

''তোমরা নিজের হাতে নিজদিগকে ধ্বংস করো না।'' (বাকারা(১৯৫ -

কেউ যদি ঋণের ভারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, যদি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে, পৃথিবীর সব কিছুই যদি তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে তবুও তার আত্মহত্যা করার কোনো অধিকার নেই। এটি ঠিক তেমনি হবে যে, সে সজ্ঞানে আরেকজনকে হত্যা করলো। কোরআন এর পরিণতি সম্পর্কে বলছেঃ

(فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا)

''কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম।'' (নিসা:৯৪(

অনেকে মনে করেন যে, নিজের জীবন নিজের হাতে, নিজের মাল নিজেরই। অতএব যা ইচ্ছা করা যায়, এ ধারণা পুরোপুরি ভুল। কারও মাল সবার আগে সমাজের, তারপর তার নিজের। তিনি কেবল তা ব্যাবহার করতে পারেন। কিন্তু তা অপচয় করা বা ধ্বংস করার অধিকার তার নেই। ইসলাম কাউকে এ ধরনের অধিকার দেয়নি।

আমাদের আলোচনা এ বিষয়ে নয়। প্রশ্ন হলো 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারে'র মূল্য কতটুকু ? 'আমর বিল মারুফের কিংবা নাহী আনীল মুনকার'- এর সম্মান কি জানমালের সম্মানের চেয়েও অধিক নয়?

দুঃখজনক হলেও বলতে হয় যে, অনেকে এমন কি কোনো কোনো নামী- দামী ‘আলেম যাদের কাছ থেকে এ ধরনের মত আশা করা যায় না তারাও বলেছেন যে, ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’- এর পিরিধ প্রাণহানি ও মানহানির সীমা পর্যন্ত । তাদের মতে, আমর বিল মারুফের কিংবা নাহী আনীল মুনকারের জীবনের মূল্যের চেয়েও কম, ধন- সম্পদ এবং মান- ইজ্জতের চেয়েও কম। বস্তুতঃ তারা ‘আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকারকে’ এ ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে নীচে নামিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অন্যরা বলেন যে, ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’- এর মূল্য এ সবের অনেক উর্দ্ধে । অবশ্য জায়গা বিশেষ। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে কি জন্যে আপনি তাকে বাধা দিচ্ছেন বা কোন কাজে তাকে আদেশ দিচ্ছেন। ধরুন, কলার খোসা রাস্তায় ফেলা উচিত নয়। তখন আপনি ঐ লোককে এ কাজ করতে নিষেধ করবেন। কিন্তু যদি আপনার গালি খাওয়ার কিংবা একটা অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনি কি নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে তাকে কলার খোসা রাস্তায় ফেলতে নিষেধ করতে যাবেন? না, দরকার নেই।

কিন্তু কোন কোন পরিস্থিতিতে ইসলাম জানমালের চেয়ে ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’কে বেশী মূল্য দিয়েছে। যেমন, আপনার চোখের সামনে কোরআন অপমানের সম্মুখীন, দুশমনদের সমস্ত প্রচেষ্টা কোরআনের আলাকে নিভিয়ে দেয়ার জন্যে ই চালানো হচ্ছে । কিংবা মুসলমানদের ঐক্যকে ভেঙ্গে- বিভেদের সৃষ্টি করছে কিংবা আদল বা ন্যায়পরায়ণতার বিরুপ্তি ঘটিয়ে অত্যাচার ও অনাচারের প্রচলন করা হচ্ছে আর ওদিকে কোরআন বলছেঃ

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)

‘‘তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তকরে ধরো এবং পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করো না।’’ (আল ইমরান (১০৩:

আরেকটি জায়গায় বলছেঃ

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)

‘‘নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রমাণাদি সহকারে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়- নীতির মানদন্ড যাতে মা ষ বিচার প্রতিষ্ঠা করে।’’ (হাদীদঃ ২৫(

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলছেন :

الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم

‘‘কাফেরের হাতেও দেশ টিকে থাকতে পারে কিন্তু যে রাজ্যে জুলুম অত্যাচার চলে তা কখনই টিকে থাকে না।’’

আর কেউ নিজের চোখে জুলুম হতে দেখেছন, নিজের চোখে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে দেখেছন, কোরআনের অবমাননা ও তা বিপদাপন্ন হতে দেখেছন তারপরও কি বলবেন যে, আমার জানের দাম, মালের দাম, ইজ্জতের দাম এর চেয়েও বেশী, ‘আমর বিল মারুফ’ করতে গেলে কিংবা ‘নাহী আনীল মুনকার’ করতে গেলে আমার মানহানির সম্ভাবনা আছে?

কাজেই ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’ এসব ক্ষে কোনো সীমানা মানে না। কোনো জিনিস, কোনো মুল্যবান সম্পদ এ সময় ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের’ সমকক্ষ হতে পারে না। এই নীতি ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’- এর মৌলিক গুরুত্বের উপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এখানে এসে আমরা এখন উপলি করতে পারি যে, ইমাম হোসাইন (আ.) ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’কে কতদূর উন্নীত করেছেন। ঠিক যেভাবে ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’ও ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনকে উন্নীত ও চির ীব করেছে। কেননা ইমাম হোসাইন (আ.) প্রমাণ করেছেন যে, জায়গা বিশেষে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের জন্যে জানমাল উৎসর্গ করতে হয়। সেদিন অনেকেই ইমামের এই আন্দোলনকে সঠিক ও উপযুক্ত পদক্ষেপ বলে মেনে নিতে পারেনি। অবশ্য তাদের চিন্তার মান অ যায়ী তাদের এই আপত্তি করাটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ইমাম হোসাইনের (আ.) চিন্তার মান এসবের অনেক উর্দ্ধে ছিল। অন্যেরা বলছিল যে, ইমাম যদি ইয়াযিদের বিরোধিতায় নামেন পরিণতিতে ইমাম জানমাল হারাবেন। ইমাম (আ.) নিজেই আ রার দিনের অবস্থা দেখে ইবনে আব্বাসকে বলেন :

لله درّ ابن عبّاس ينظر من ستر رقيق

'সাবাস! তুমি ভালই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারো।' কারণ, ইমাম যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হন তখন ইবনে আব্বাস বলেছিলেনঃ 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কুফাবাসীরা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, অনেকেই সেদিন এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। কিন্তু ইমাম জবাবে বলেছিলেন :

لا يخفى علىّ الامر

'তোমরা যা বলছো তা আমার অজ্ঞাত নয়, আমিও তা জানি।'

মূলতঃ ইমাম হোসাইন (আ.) বিশ্বকে বোঝালেন যে, 'আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকারের' জন্যে জীবনও দেয়া যায়, ধন- সম্পদ সবকিছু উৎসর্গ করা যায়। ইসলামের এই ভিত্তিটির জন্যে পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো ব্যাক্তি কি ইমাম হোসাইনের (আ.) ন্যায় আত্মত্যাগ করতে পেরেছে? ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনের অর্থ হয় যে, 'আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকারের' মূল্য এত বেশী যে তার জন্যে এ ধরনের আত্মত্যাগও করা যায়।

ইমাম হোসাইনের (আ.) বিপ্লবের পর একথা বলার আর কোনো অবকাশ থাকে না যে, 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার' কেবল মান- প্রাণহানির সীমা পর্যন্ত সম্ভব।

তবে হ্যাঁ, ফ্যাসাদের সম্ভাবনা থাকলে অন্য কথা। অনেক সময় দেখা যায় যে, আমরা ইসলামের স্বার্থে আমর বিল মারুফ করবো কিংবা নাহী আনীল মুনকার করবো বটে; কিন্তু এর চেয়ে বেশী ক্ষতি ইসলামকে আক্রান্ত করার সম্ভাবনা আছে। যেমন ধরুন যে, 'আমর বিল মারুফ কিংবা নাহী আনীল মুনকার' করতে গিয়ে একজন মুসলমানকে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাবাপন্ন করে তুললাম এবং সে ইসলামকে বর্জন করলো- তাহলে এখানে ইসলামের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হলো। তরাং এখানে 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার' প্রয়োজন নেই। অবশ্যএ ক্ষতি ইসলামের উপর অর্পিত হয় বলেই। কেননা, এ ক্ষতি যদি ব্যাক্তিগত কোনো ক্ষতি হতো তাহলে কিন্তু 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারই সম্পন্ন করতে হতো। কারণ ইমাম হোসাইন (আ.) তা নিজে করে দেখিয়েছেন। ইমাম দেখিয়েছেন যে, তিনি এই ভিত্তিতেই

আন্দোলন করেছেন কিংবা কমপক্ষে তার আন্দোলনের একটা অন্যতম কারণ ছিল এটিই। মোয়াবিয়ার আমলেই ইমামের (আ.) তৎপরতা থেকে বুঝা যেত যে, তিনি আসন্ন বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহর (সা.) সাহাবীদেরকে তিনি মিনায় সমবেত করে তাদের সাথে আলোচনা করলেন, তৎকালীন দুরবস্থা তুলে ধরলেন, সত্য পথের নির্দেশনা দিলেন। তারপর বললেন এখন এর সংস্কার করার দায়িত্ব আপনাদেরই। 'তুহাফুল উকুল' গ্রন্থে বর্ণিত ইমাম হোসাইনের (আ.) এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বক্তব্য ইমামের চিন্তাধারা কেমন ছিল তা স্পষ্ট তুলে ধরে। মোয়াবিয়ার শেষ বয়সে ইমাম হোসাইন (আ.) এক চিঠিতে তাকে বিভিন্ন ভাষায় অভিযোগ করে লিখেন : 'হে মোয়াবিয়া ইবনে আবু ফিয়ান! আল্লাহর কসম করে বলছি যে, আমি যে এ মুহূর্তে তোমার সাথে যুদ্ধে নামছি না এ জন্যে আল্লাহর কাছে জবাবিদিহ করতে হয় কিনা, সেই ভয় করছি।' অর্থাৎ তিনি বলতে চান, জেনে রাখ আজ যদি হোসাইন চুপ করে থাকে তার অর্থ এই নয় যে, আজীবন চুপ করেই থাকবে বা কোনো দিন বিদ্রোহ করবে না। বরং একটি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকা মা । যে সময় বিদ্রোহ করলে সর্বাধিক ফলপ্রদ হয় এবং তার লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত হয় সে সময়েই তিনি বিদ্রোহ করবেন। যেদিন ইমাম মক্কা ছেড়ে আসেন সেদিন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার কাছে লেখা অসিয়তনামায় তিনি এ বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি লিখেন :

انّى ما خرجت اشرا و لا مفسدا و لا ظالما و انّما خرجت لطلب الاصلاح فى أمّة جدّى، أريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر.

''আমি কোনো ধন- সম্পদ বা ক্ষমতার লোভে কিংবা কোনো গোলযোগ সৃষ্টির জন্যে বিদ্রোহ করছি না, আমি ধু আমার নানার উম্মতের মধ্যে সংস্কার করতে চাই, আমি 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার' করতে চাই এবং আমার নানা যে পথে চলেছেন আমিও সেই পথে চলতে চাই।'' (দ্রঃ মাকতালু খারাযমীঃ ১(১৮৮/

ইমাম হোসাইন (আ.) দীর্ঘ পথ চলার সময় একাধিকবার তার এই লক্ষ্যকে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন। বিশেষ করে এ সময়গুলোতে তিনি বাইয়াত প্রসঙ্গেরও যেমন কোনো উল্লেখ করেননি

তেমনি দাওয়াত প্রসঙ্গেরও কোনো উল্লেখ করেননি। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল পথিমধ্যে তিনি যতই কুফা সম্পর্কে ভয়ানক ও হতাশা ব্য ক খবর নছিলেন ততই তার বক্তব্য জ্বালাময়ী হয়ে উঠছিল। সম্ভবতঃ ইমামের দূত মুসলিম ইবনে আকীলের শহীদ হবার সংবাদ নেই ইমাম এই বিখ্যাত খোতবা প্রদান করেনঃ

ايّها الناس، إنّ الدنيا قد ادبرت و اذنت بوداع، و انّ الاخرة قد اقبلت و اشرفت بصلاح

'হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবী আমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে, আমাকে বিদায় জানাচ্ছে । পরকাল আমাকে সাদরে বরণ করছে, উপযুক্ত মর্যাদা দিচ্ছে ।''

الا ترون ان الحق لا يعمل به، و ان الباطل لا ينتهى عنه؟ ليرغب المؤمن فى لقاء الله محقاً

''তোমরা কি দেখতে পাচ্ছনা যে সত্য অ সারে আমল করা হচ্ছে না, তোমরা কি দেখতে পাও না যে আল্লাহর বিধানসমূহকে পদদলিত করা হচ্ছে ? দেখতে পাওনা যে চারদিকে ফেতনা-ফ্যাসাদে ছেয়ে গেছে অথচ কেউ এর প্রতিবাদ করছে না?''

ليرغب المؤمن فى لقاء الله محقا

''এ অবস্থায় একজন মুমিনের উচিত নিজের জীবন উৎসর্গ করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা। যদি জীবন উৎসর্গ করতে হয় তাহলে এটাই তার উপযুক্ত সময়।'' (দ্রঃ তুহফাল উকুলঃ ২৪৫ (অর্থাৎ 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার' এতই মূল্যবান। পথিমধ্যে উচ্চারিত অন্য আরেকটি খোতবায় ইমাম সার্বিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ

.انّى لا ارى الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمين الا برما

''হে লোকসকল! আমি এই পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণকে কল্যাণ ও মর্যাদাকর ছাড়া আর কিছুই মনে করি না।'' অর্থাৎ একে আমি সত্যের জন্যে শহীদ হওয়া মনে করি। এ থেকে বোঝা যায় যে 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার' করতে গিয়ে নিহত হলে সে শহীদের মর্যাদার অধিকারী হবে। .

و الحياة مع الظالمين الابرما

‘‘আর জালেমদের সাথে বেঁচে থাকাকে আমি নিন্দাকর অপমান মনে করি। আমার আত্মা এমন আত্মা নয় যে, জালেমদের সাথে আপোষ করে বেঁচে থাকতে পারবে।’’ ইমাম এর চেয়ে আরো বড় কথা বলেন যখন অবস্থা শতভাগ প্রতিকূল হয়ে ওঠে। কাফেলা যখন ইরাকের সীমানায় পৌঁছায় তখন হুর ইবনে ইয়াযিদ আর- রিয়াহীর এক বিশাল বাহিনীর বাধার সম্মুখীন হন। হুর এক হাজার সৈন্যযোগে ইমামের কাফেলাকে বন্দী করে কুফায় নিয়ে যাবার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। তাবারীর মতো বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকগণ ঐ মুহুর্তে ইমামের সেই বিখ্যাত খোৎবার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম ঐ খোতবায় রাসূলুল্লাহর (সা.) উদ্ধৃতি দিয়ে ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন :

ايها الناس من رآى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله مستأثرا لفىء الله، معتديا لحدود الله، فلم يغيّر عليه بقول و لا فعل كان حقا على الله يدخله مدخله، الا و انّ هولاء القوم قد احلّوا حرام الله و حرّموا حلاله، و استأثروا فىء الله.

(তিনি দুটো পরিপূর্ণ সূ ে র সাহায্য নেন। প্রসিদ্ধ নিয়মা যায়ী তিনি প্রথমে একটা সাধারণ সূ ে র উল্লেখ করেন) ‘‘হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ‘যদি কেউ কোনো অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী সরকারকে দেখে যে হালালকে হারাম করে, হারামকে হালাল করে, বায়তুলমালকে নিজের ব্যাক্তিগত খাতে খরচ করে, আল্লাহর বিধি- বিধানকে পদদলিত করে, মুসলমানের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করে না, এরপরও যদি সে নিশ্চুপ বসে থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে ঐ জালেমদের সাথে একই শাস্তি প্রদান করবেন।

و انّ هولاء القوم..

আজকে যারা হুকুমত করছে তারা কি ঐসব জালেম ও স্বৈরাচারীদের মতন (বনি উমাইয়ারা) নয়? দেখতে পাও না যে তারা হালালকে হারাম করেছে আর হারামকে হালাল? তারা কি আল্লাহর বিধানকে পদদলিত করেনি? বায়তুলমালের অর্থকে তারা কি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেনি? আত্মসাৎ করেনি? তাই এরপরও যারা নীরবতা অবলম্বন করবে তারাও ইয়াযিদদের মতোই বলে সাব্যস্ত হবে।’’ এবার তিনি নিজের প্রসঙ্গে বলেন :

و انا احقّ من غير

‘‘আর আমার নানার এই আদেশ পালন করতে অন্যদের চেয়ে আমিই বেশী যোগ্য, আমারই দায়িত্ব অধিক ।’’ (দ্রঃ তারিখে তাবারীঃ ৪(৩০৪/

কোনো মা ষ যখন ইমাম হোসাইনের (আ.) এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত হয় তখন বলে যে, এ ধরনের ব্যক্তিই তো চির ভাস্বর হয়ে থাকার অধিকার রাখেন। তিনিই তো চির ীব থাকার যোগ্য । কেননা হোসাইন নিজের জন্যে ছিলেন না। তিনি নিজেকে মা ষ ও মানবতার জন্যে উৎসর্গ করেছেন। একত্ববাদ, ন্যায়পরায়ণতা এবং ম ষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। আর এ কারণেই সব মা ষই তাকে ভালবাসে, তাকে শ্রদ্ধা করে। যখন কোনো মা ষ এমন একজনকে দেখে যার নিজের জন্যে কিছুই নেই, মান- সম্মান, মর্যাদা, মানবতা যা আছে তা সবই অন্যের জন্যে - তখন সে নিজেকে ঐ ব্যক্তির সাথে একাত্ম করে নেয়।

হুর ইমাম হোসাইনের (আ.) সাথে সাক্ষাতে ইমামকে কুফায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে ইমাম এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি কখনো অপমানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাননি। ম ষ্যত্বের মাহত্ম্য ও মর্যাদাকেই তিনি অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন। তিনি বললেনঃ আমি যাব না। শেষ পর্যন্ত আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, তিনি এমন এক রাস্তায় যাবেন যে রাস্তা কুফারও নয়, মদীনারও নয়। অবেশেষ তিনি মহররম মাসের দুই তারিখে কারবালা ভূখন্ডে এসে পৌঁছুলেন। প্রায় ৭২ জন সঙ্গী- সাথীসহ সেখানে তাঁবু গাড়লেন। ওদিকে হুরের বাহিনীও কিছুদূরে তাঁবু গাড়লো। কুফার গভর্ণরের দূতরা অনবরত যাওয়া- আসা রু করলো। পরের দিনগুলোতে শত্রুদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো এবং নতুন নতুন বাহিনী এসে উপস্থিত হল। এক হাজার, পাঁচ হাজার এভাবে ৬ তারিখের দিনের বেলা ি শ হাজারে পৌঁছলো।

কুফার গভর্ণর ইবনে যিয়াদ এই বিশাল বাহিনীর দায়িত্ব ভার ইবনে সা’দের হাতেই সোপর্দ করলো। ইবনে যিয়াদের ধারণা ছিল ইবনে সা’দই তাকে হুকুমত এবং ইমারত লাভে সফল করবে। মোদ্দকথা ইবনে যিয়াদ এমন একজনকে নির্বাচিত করলো যাকে দেখে মুসলমানরা মনে করে যে, (নাউযুবিল্লাহ) ইবনে সা’দ অতীতের মতোই যারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে

তাদের সাথে যুদ্ধে নেমেছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর যুগে ইবনে সা'দ কাফেরদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়ে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। অবশ্য ইবনে যিয়াদ যে ইবনে সা'দকে ব্যাবহার করতে চাচ্ছে একথা ইবনে সাদ ধরে ফেলেছিল। তাই সে ইবনে যিয়াদের কাছে গিয়ে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলো। কিন্তু ইবনে যিয়াদও ইবনে সা'দের দুর্বলতা কোথায় তা ভাল মতো জানতো। তাই আগেই একটা ডিক্রীপে ইবনে সা'দের জন্যে গুরগান ও রেই প্রদেশের গভর্ণর পদে নিযুক্তিরকথা লিখে রেখেছিল। এ কারণে ইবনে সা'দ যখন দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানাতে আসে তখন ইবনে যিয়াদ বলেঃ ঠিক আছে, তাহলে মনে হে এই ডিক্রীপ টা এখন অন্য জনের নামে লিখতে হয়! ইবনে সা'দ এবার সিদ্ধান্তের ক্ষে দ্বন্দে ভুগতে লাগলো। কারণ এ ধরনের একটা গভর্ণরের পদ তার বহু দিনের খায়েশ। ইবনে সা'দ বললো, আমাকে একটু অবসর দাও, একটু ভেবে নেই। ইবনে সা'দ যার সাথেই আলোচনা করলো সবাই তাকে নিন্দাবাদ করে বললো যে, তুমি নবীর সন্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইবনে সা'দের কামনার প্রবৃত্তি বিজয়ী হলো এবং ইবনে যিয়াদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিল। ইবনে সা'দ কারবালায় এসে প্রচেষ্টা করলো খোদা ও খোরমা দুটোই পেতে। সে যে কোনোভাবে ইমামকে একটা আপোষে রাজী করতে প্রচেষ্টা চালালো যাতে অন্ততঃপক্ষে নবীর সন্তানকে হত্যা করার দায় থেকে সে বাচতে পারে। তারপরে যাহোক দেখা যাবে। ইমাম হোসাইনের (আ.) সাথে এরপর তার দু'- তিনটি আলোচনা অ ষ্ঠিত হল। ঐতিহাসিক তাবারী লিখেছেন যে, যেহেতু এই বৈঠকগুলো কেবল দু'জনের মধ্যে অ ষ্ঠিত হয়েছিল- তাই কি আলোচনা হয়েছিল তা সবিস্তারে উদ্ধার করা যায়নি। কি যেটুকু ইবনে সাদ পরে ফাঁস করে তা থেকে বোঝা যায় যে, এমন কি কিছু মিথ্যা প্রলোভনের আশ্রয় নিয়ে ইবনে যিয়াদ ইমামকে আপোষে টানার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায়। ইবনে সা'দের সর্বশেষ চিঠি যখন ইবনে যিয়াদের হাতে পৌঁছলো তখন কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ ও তার পাশে বসে ছিল। এ চিঠি পড়ে ইবনে যিয়াদ বললো যে হয়তো ব্যাপারটির শান্তিপূর্ণ সামাধান সম্ভব। কিন্তু তার চারপাশের ইবলিসী দালালদের মধ্যে থেকে শিমার ইবনে যিল জুউশান বলে উঠলোঃ

‘‘হে আমীর! তুমি একটা অমার্জনীয় ভুল করতে যাচ্ছ । ইমাম হোসাইন (আ.) এ মুহূর্তে তোমার হাতের মুঠোয়। এখান থেকে যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে পরে তাকে আর নাগালে আনা সহজ হবে না। এ দেশে হযরত আলী (আ.)- এর অ সারী কম নেই। তারা কেবল কুফায় নয়। তুমি কি বুঝবে না যে, আশপাশ থেকে ইমাম হোসাইনের (আ.) অ সারীরা তার সাথে যোগ দেব? আর যদি সত্যিই ইমাম হোসাইনের (আ.) অ সারীরা তার সাথে যোগ দেয় তাহলে তোমার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। ইতিহাসে আছে যে, একথা নে ইবনে যিয়াদের যেন টনক নড়ে উঠলো। বললোঃ হ্যাঁ ঠিকই তো। এরপর সে ইবনে সা’দের চিঠির জন্যে তাকে অভিসম্পাত করে বললো, ইবনে সা’দ যে আমাকে প্রায় ঠকিয়ে দিয়েছিল। এরপর সে ইবনে সা’দকে লিখে পাঠালো, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি আমার হুকুম পালন করবার জন্যে, আমাকে তুমি পিতার মতো উপদেশ লিখে পাঠাবে এ জন্যে তো নয়! তুমি একজন সেনা প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছো, শৃঙ্খলা মেনে চলো আর কোনো টু’শব্দ ছাড়াই আমার আদেশ পালন করো। যদি এ কাজ না পারো তাহলে বলো, আমি অন্য আরেকজনকে নিয়োগ করবো। ইবনে যিয়াদ শিমারের মাধ্যমে এই চিঠিতে একটা আদশনামা লিখে বললো, ইবনে সা’দ যদি হোসাইনের (আ.) সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে শিমার (শিমার) এই আদেশনামার জোরে তার শিরচ্ছেদ করবে। তারপর সেনা প্রধানের দায়িত্ব তোমার হাতেই থাকবে।

লিখিত আছে যে ৯ মহররমের বিকালে ইবনে সা’দের হাতে এ চিঠি পৌঁছায়। শিমার চিঠিটি ইবনে সা’দকে দিল। শিমারের আশা ছিল যে, ইবনে সা’দ বলে উঠবে, না! আমি নবীর সন্তানকে হত্যা করতে পারবো না।

তাহলেই শিমার ঐ গোপন আদেশনামার জোরে তার শিরচ্ছেদ করে সে নিজেই সেনাপতি হতে পারবে। কিন্তু ইবনে সা’দ শিমারের মিথ্যা আক্ষেপের অবসান ঘটিয়ে বলে উঠলোঃ আমার ধারণা ছিল যে, আমার চিঠি পড়ে ইবনে যিয়াদের হুশ আসবে। কিন্তু তুমি তাকে ভুলিয়ে- ভালিয়ে তা হতে দাওনি।

শিমার বললঃ আমি ওসব কিছু বুঝি না। ধু নতে চাই যে, শেষ পর্যন্ত তুমি যুদ্ধ করতে রাজী আছা কিনা। ইবনে সা'দ এবার বললোঃ অবশ্যই করবো। এমন যুদ্ধ করবো যাতে হাত- পা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে আকাশে নিক্ষিপ্ত হবে।

শিমার বললঃ ঠিক আছে। তাহলে এখন আমার দায়িত্ব কি?

ইবনে সা'দ জানতো যে ইবনে যিয়াদের কাছে শিমারের ভালই কদর রয়েছে। তাই শিমারকে বললোঃ তুমি হবে পদাতিক বাহিনীর কমান্ডার।

৯ মহররমের ঐ চিঠিতে কড়া আদেশ লেখা ছিল। ইবনে যিয়াদ লিখেছিল : আমার চিঠি পৌঁছানোর সাথে সাথেই ইমাম হোসাইনকে (আ.) জোর অবরোধের মধ্যে ফেলবে। ইমাম হোসাইনকে (আ.) হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে নতুবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। এর বাইরে তৃতীয় কোনো পথ নেই। ইবনে সা'দ এই আদেশ পেয়ে ইমামের তাবুগুলোর চারপাশে সেনা মোতায়েন করে জোর অবরোধ সৃষ্টি করলো। ইমাম হোসাইন (আ.) তাদের এ ধরনের চাল- চলন দেখে হযরত আব্বাসকে যুহাইর ইবনে কাইন এবং হাবিব ইবনে মাযাহিরের সাথে পাঠিয়ে কি খবর জেনে আসতে বললেন। হযরত আব্বাস, নতুন কোন সংবাদ আছে কি?

ইবনে সা'দ বললোঃ হ্যাঁ, ইবনে যিয়াদ আদেশ পাঠিয়েছে যে, ইমাম হোসাইনকে (আ.) হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে আর নয়তো যুদ্ধের পথ বেছে নিতে হবে।

হযরত আব্বাস বললেনঃ আমি নিজের পক্ষ থেকে তো কোনো জবাব দিতে পারি না। ঠিক আছে, আমি ইমামের বক্তব্য জেনে এসে তোমাদেরকে বলছি।

হযরত আব্বাস ইমাম হোসাইনের (আ.) কাছে ফিরে এসে ব্যাপারটা জানালেন।

ইমাম জবাবে বললেনঃ আমরা আত্মসমর্পণ করি না। যুদ্ধই আমরা করবো শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত । তবে ওদেরকে গিয়ে ধু একটা কথাই বলো, ধু একটা অ রোধ করো যে, কাল সকাল পর্যন্ত আমাদের সময় দেয়া হোক। অনেকে হয়তো বলতে পারে যে, ইমাম হোসাইন (আ.) বেঁচে থাকতে খুবই ভালবাসতেন। তাই ঐ এক রাতকে জীবনের জন্যে গনীমত হিসাবে পেলেন। কিন্তু ইমাম নিজেই বলছেনঃ ''স্বয়ং আল্লাহ জানেন আমি এই অবসরটুকু কি জন্যে চেয়েছি। আমার

মন- প্রাণ শেষবারের মতো একবার আল্লাহর সাথে অ নয়- বিনয় করতে চায়। শেষবারের মত নামায পড়তে, দোয়া ও মোনাজাত করতে এবং কোরআন তেলাওয়াত করতে চায়। এই রাতটাকে জীবনের শেষ রাত হিসাবে আমি আল্লাহর ইবাদত করতে চাই।''

হযরত আব্বাস ফিরে এসে ইবনে সা'দকে ইমামের মতামত জানালেন এবং ইমামের অ রোধ ও বললেন। তারা অনেকেই ইমামের অ রোধ প্রত্যাখ্যান করতে চাইলো। কিন্তু অনেকে এর প্রতিবাদ করে বললো যে- তোমরা সত্যিই বেশরম। যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধ হতো তখন তারা যদি এরকম প্রস্তাব দিত তাহলে তা গ্রহণ করা হতো। আর নবীর সন্তান শেষবারের মতো আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে একটা রাত অবসর চেয়েছে, তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছো! এভাবে তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত ইবনে সা'দ, সৈন্যদের মধ্যে ঐক্য রক্ষারস্বার্থে ইবনে যিয়াদের আদেশকে কিছুটা উপেক্ষা করে বললোঃ ঠিক আছে, কাল সকালে!

ইমাম হোসাইন (আ.) এই আ রার রাতে গভীর ইবাদেত নিমগ্ন হন। এক আধ্যাত্মিক, জ্যোতির্ময় এবং ঐশী পরিবেশে তিনি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হন। যারা এই রাতকে ইমাম হোসাইনের (আ.) মে'রাজের রাত বলে আখ্যায়িত করেছেন তারা সত্যিই যথার্থ কথাই বলেছেন। আ রার রাতে ইমাম সব সঙ্গী- সাথীদেরকে ডেকে বললেনঃ হে আমার সহযোগীরা, হে আমার পরিজনরা! আমি আমার সহযোগী এবং আমার পরিজনদের চেয়ে উত্তম কোনো সহযোগী এবং পরিজন খুঁজে পাইনি। তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ । তবে সবাই শোনো, ওরা কিন্তু কেবল আমাকেই চায়। আমাকে ছাড়া আর কারো সাথে ওদের কোনো কাজ নেই। তোমরা যদি আমার হাতে বাইয়াত করে থাকো তাহলে আমি সে বাইয়াত তুলে নিলাম, তোমরা সবাই এখন স্বাধীন। তোমাদের মধ্যে যে চলে যেতে চায় সে এখন অনায়াসেই চলে যেতে পারে। আর পারলে আমার পরিজনদের একজনকে হাত ধরে নিয়ে যাও! ইমামের মুখের দিকে চেয়ে অনেকে বিগিলত হতে পারে এ কারণে ইমাম এবার আলো নিভিয়ে দিয়ে বললেনঃ তোমরা এই অন্ধকারের যোগ নিয়ে যেতে পার। কেউ তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।

ইমামের একথা নে সবাই এক সাথে বলে উঠলোঃ হে ইমাম, একি কথা আপনি আমাদেরকে বলছেন? আমরা আপনাকে একা রেখে চলে যাব? আমাদের সামা একটা প্রাণের চেয়ে বেশী কিছু নেই যা দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারি! আল্লাহ যদি আমাদেরকে পর পর এক হাজারটা জীবন দান করতেন এবং এক হাজার বার আমরা আপনার রাস্তায় কোরবানী হতে পারতাম এবং জীবিত হয়ে পুনঃ পুনঃ আপনার জন্যে কোরবানী হতে পারতাম! এই সামান্য একটা প্রাণ তো আপনার রাস্তায় খুবই নগণ্য । আমাদের এই নগণ্য জীবন আপনার রাস্তায় কোরবানী হবার যোগ্য নয়। বলা হয়েছেঃ

بدأهم بذلك اخوه ابو الفضل العبّاس

''সর্ব প্রথম যিনি একথা বলেছিলেন তিনি হলেন ইমামের বীর ভাই হযরত আবুল ফযল আল-আব্বাস।'' ইমাম তাদেরকে এই চুড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখে আরো কিছু নতুন সত্যের পর্দা খুলে দিলেন। তিনি বললেনঃ এখন আমি হাকিকতকে তোমাদের সামনে বলতে চাই। সবাই জেনে রাখ যে, আগামীকাল আমরা সবাই শহীদ হবো।

আমাদের মধ্যে কেউই বেঁচে থাকবে না। সবাই বলে উঠলোঃ আল্লাহকে লাখো শোকর যে, এ ধরনের একটা শাহাদাতের মর্যাদা আমাদেরকে দান করেছেন। যখন ইমাম হোসাইন (আ.) শাহাদাতের এই সংবাদ ঘোষণা করলেন তখন ১৩ বছরের একটা বালকও এই মজলিসে বসেছিলেন। তিনি ছিলেন ইমাম হাসানের পু কাসেম। তিনি খুবই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন, ইমাম যে শাহাদাতের কথা বললেন তা বোধহয় কেবল বড়দের ভাগ্যেই আছে। আমি হয়তো এর শামিল হতে পারবো না। ১৩ বছরের বালক, এ ধরনের চিন্তা করাই স্বাভাবিক। তিনি গভীর চিন্তা করতে করতে এক সময় মাথা তুলে বললেনঃ

يا عمّا، و انا فيمن يقتل؟

''হে চাচাজান, আমিও আগামীকালের শহীদদের মধ্যে আছি?

ইমাম হোসাইন (আ.) একটা দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। তারপর বললেনঃ হে প্রিয় কাসেম ! আমি আগে তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তার জবাব দাও। তারপর তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।

হযরত কাসেম বললেনঃ চাচাজী আপনার প্রশ্ন কি?

ইমাম জিজ্ঞেস করলেনঃ বলতো দেখি মৃত্যুস্বাদ তোমার কাছে কেমন লাগবে?

হযরত কাসেম বললেনঃ

احلى من العسل

''চাচাজী! মধুর চেয়েও মিষ্টি''

অর্থাৎ আমি যে জিজ্ঞেস করলাম শহীদদের মধ্যে আমি আছি কিনা তার কারণ হলো যে, ভয় পাচ্ছিলাম আমি এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হই কিনা।

ইমাম বললেনঃ হ্যাঁ, কাল তুমিও শহীদ হবে।

এ ছিল সত্যের অ সারী ইমাম হোসাইনের (আ.) সাহায্য কারীদের আত্মার একটা স্বরূপ । আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ইমাম হোসাইনের (আ.) সহযোগীদের এ অসামান্য বীরত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

হোসাইনী বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যাবলী

ইমাম হোসাইনের (আ.) এই বিপ্লব সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাদের মধ্যে একটি হলো এ বিপ্লব কি পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত হয়েছিল নাকি তা ছিল সহসা কোনো বিস্ফোরণ ? অর্থাৎ এ বিপ্লব কি কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হয়ে সংঘটিত হয়েছিল নাকি কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া ছাড়াই সবার অজ্ঞাতে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ছিল?

ডায়ালেকটিক তথা দ্বান্দিক বস্তবাদীরা বলেন, যদি কোথাও বিপ্লব ঘটাতে চাও তাহলে সেখানকার জনগণের মধ্যে অভাব- অনটন, অরাজকতা ও নির্যাতন বাড়াতে থাকো, জনগণের মধ্যে যতবেশী সম্ভব অসন্তোষ সৃষ্টি করতে থাকো। তাহলে এক সময় যখন এসব অনটন, নিপীড়ন ও অসন্তোষ তাদের ধৈর্য- সহ্যের বাইরে চলে যাবে তখন তারা নিজেরাই বিস্ফোরণের মতো রোষে ফেটে পড়বে। আর যারা বিপ্লবীর খ্যাতি গলায় পরতে চায় তাদের জন্যে এটাই বিধাজনক। এ যোগের সদ্ব্যাবহার করতে পারলে শীঘ্রই তারা ‘বিপ্লবী’, ‘বিদ্রোহী’ এসব বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হতে পারবে। ঠিক একটা বেলুন যেমন বাতাস ভরতে ভরতে এক সময় বেলুনের ধারণ ক্ষমতা শেষ হয়ে যায় এবং প্রচণ্ড বাতাসের চাপে বেলুন ফেটে যায়। এ সকল বস্তবাদীর বিপ্লবও ঠিক এ ধরনের একটা ঘটনা।

অনেক সময় দেখা যায় যে, একজন মা ষ কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে এসে এক কথা মুখ থেকে বের করতে চায় না। যতই চাপ সৃষ্টি করা হোক না কেন, কোন ক্রমেই সে তা বলতে রাজী নয়। কিন্তু এক পর্যায়ে যখন অসহ্য হয়ে পড়ে তখন সে বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ে এবং তখন ধু একটা কথা নয়, বরং সে এতসব কথা বলতে থাকে যা আদৌ নতে চাওয়া হয়নি এবং তাকে তখন চুপ করানোই মুশকিল হয়ে যায়। এ হলো বিস্ফোরণ।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী আদর্শকে বস্তুগত কোনো আদর্শ থেকে শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে তার মধ্যে একটা হলো যে, বস্তবাদীরা বিস্ফোরণ আকারের বিপ্লবে

বিশ্বাসী, অথচ ইসলাম এ ধরনের কোনো বিপ্লবে বিশ্বাসী নয়, তা মেনেও নেয় না। ইসলামী বিপ্লব একশতভাগ জ্ঞাতসারে পরিকল্পনা মাফিক নির্দিষ্ট পথ ধরেই আসে।

ইমাম হোসাইনের (আ.) বিপ্লব সম্পর্কেও এ বিষয়টি বহুল আলাচিত। ইমামের এই বিপ্লব কি অজ্ঞাতভাবে এবং বিস্ফোরণ আকারে ঘটেছিল? বনী উমাইয়ারা বিশেষ করে মোয়াবিয়া বিন হাশেমের ওপর যে অপব্যাবহার ও নির্যাতন চালিয়ে এসেছে আর এ কারণে যখন ইয়াযিদের হাতে ক্ষমতা গেল, অমিন ইমাম পরিবারের সহ্যের বাইরে চলে গেল আর তারা বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, আর সহ্য করা যাবেনা (নাউজুবিল্লাহ)। ইমাম হোসাইনের (আ.) বিপ্লব কি এভাবেই সংঘটিত হয়েছিল ?

এ প্রশ্নের জবাব আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকে সহজেই বোধগম্য । মোয়াবিয়ার সাথে ইমামের যেসব কথা কাটাকাটি ও চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল তা থেকে বোঝা যায় যে, মোয়াবিয়ার আমল থেকেই ইমামের আন্দোলন রু হয় এবং এ আন্দোলন সম্পূর্ণ জেনে নে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সংঘটিত হয়েছিল। বিশেষ করে ইমাম রাসূলুল্লাহর (সা.) বিশিষ্ট্য সাহাবাদেরকে মিনায় সমবেত করে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশকরেন এবং তোহাফুল উকুল গ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ আছে তা থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, ইমাম সম্পূর্ণ জেনে নে পরিকল্পনা মাফিক পদক্ষেপ নিয়ে ধাপে ধাপে এই বিপ্লবকে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌছিয়েছেন। এ বিপ্লবই, বিস্ফোরণ নয়। ইসলামী বিপ্লব, বিস্ফোরণের বিপ্লব নয়।

ইমাম হোসাইন (আ.) প্রত্যেককেই এ বিপ্লবকে বিস্ফোরণের রূপ দেয়া থেকে বিরত রাখেন। ইমাম কেন প্রতি মুহূর্তে যে কোনো একটা বাহানায় তার সঙ্গীদেরকে অব্যাহতি দিতে চান? বারংবার তিনি তাদেরকে বলেন, ''দেখ, এখানে খাদ্য নেই, পানীয় নেই, বরং বিপদ আছে, আছে মৃত্যু।'' এমন কি আ রার রাতেও তিনি আরও কোমলতার সাথে বললেন : ''আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম কোনো সহযোগীর সন্তান পাইনি। তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ । এই পাষন্ডরা কেবল আমাকেই চায়। তোমাদের কারও সাথে তাদের কোনো কাজ নেই। তোমরা চাইলে অনায়াসে চলে যেতে পারো। এমন কি ওরা যদি

জানে যে, তোমরা চলে যা তাহলে তোমাদের একটুও ক্ষতি করবে না। আমি বরং এখানে একাই থাকি।'' কেন ইমাম এ ধরনের কথা বললেন? বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যে নেতা বিপ্লব করতে চায়, সে তো কখনো এ ধরনের কথা বলবে না। ইমাম যা বলছেন তা শরীয়তের দৃষ্টি কোণ থেকেই বলছেন। অবশ্য শরিয়তী দায়িত্বও ছিল এবং এদিকটিও ও তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে, শরিয়তী দায়িত্ব ও যেন সবাই সজ্ঞানে পালন করতে পারে। তাই তিনি বললেন, ''দেখ, দুশমন তোমাদেরকে অবরোধ করেনি। দুশমনদের প থেকেও তোমাদের জন্যে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যদি রাতের অন্ধকারে তোমরা চলে যেতে পার তাহলে কেউই তোমাদেরকে বাধা দেবে না। বন্ধুর পক্ষ থেকেও তোমাদের জন্যে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এমন কি আমার হাতে যে বাইয়াত করেছিল তাও তুলে নিলাম। যদি বাইয়াতের কারণে তোমরা সমস্যা মনে করো তাহলে এখন আর সে সমস্যাও রইলো না, তোমরা এখন সবাই মুক্ত ও স্বাধীন।'' অর্থাৎ এখন কেবল জেনে নে সজ্ঞানে বেছে নেয়ার পালা। এখন যদি হোসাইনকে সাহায্য করতে চাও তাহলে কোনো বাধ্যবাধকতার অ ভূতি ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সজ্ঞানে এসো। এখানেই ছিল ইমাম হোসাইনের (আ.) বিপ্লবের শ্রেষ্ঠত্ব।

এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের হাতে স্পেনের পতনের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তারিক ইবনে যিয়াদ মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে যখন স্পেনের –ভূ- খন্ডে প্রবেশ করলেন তখন আদেশ দিলেন সমস্ত জাহাজ ডুবিয়ে দাও। আর মা ২৪ ঘন্টার জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য সমগ্রী রেখে দিয়ে বাকীগুলো পানিতে ফেলে দাও।'' এরপর তারেক সৈন্যদেরকে ডেকে বললেন, ''দেখা, যদি পালাতে চাও তাহলে যুবে মরা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ একটাও জাহাজ আর নেই। আর যদি আলসেমি করতে চাও তাহলেও মা একিদন বাচতে পারবে। কেননা আমাদের হাতে এখন মা ২৪ ঘন্টার খাদ্য সামগ্রী রয়েছে। তরাং এখন একটাই মা পথ। তা হলো শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা। তাদেরকে পরাজিত করতে পারলেই কেবল তোমরা বেঁচে থাকার আশা করতে পারবে। মোটকথা, তাদেরকে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হল। এমন একটি পরিস্থিতিতে সৈন্যরা যুদ্ধ না করে কি করতে পারে? অথচ

ইমাম হোসাইন (আ.) তার সঙ্গীদের সাথে তারেক ইবনে যিয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করলেন। তিনি বললেন না দেখ, আমাদের চারদিকে শত্রু। এদিক দিয়ে গেলও তোমাদেরকে শেষ করবে, ওদিক দিয়ে গেলও শেষ করবে। যেভাবে হোক তোমাদেরকে এখানেই মরতে হবে। আর মরতেই যখন হবে তখন এসো আমার সাথেই মৃত্যুবরণ করো।

ইমাম হোসাইন (আ.) কখনই একথা বলেননি। কারণ এ ধরনের মৃত্যুর তো প্রকৃত কোনো মূল্য নেই। এটি একজন সাধারণ পলিটিশিয়ানকে মানায়। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) যিনি একটি চিরন্তন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চান তার জন্যে তো এটি মানায় না। বরং ইমাম বললেন, তোমাদের সামনেও শত্রু নেই আর পিছনেও কোনো সমুদ্র নেই। শত্রুও তোমাদেরকে বাধ্য করবে না, বন্ধুও তোমাদেরকে বাধ্য করবে না। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যেটা পার বেছে নাও।

তরাং সবার আগে স্বীকার করতে হবে যে, ইমাম হোসাইনের (আ.) বিপ্লব ছিল স্বাধীনভাবে সজ্ঞানে এবং নির্দিষ্ট লক্ষে পরিচালিত একটি বিপ্লব। এ অবগতি যেমন ইমামেরও ছিল তেমনি তার প্রত্যেকটি সহযোগীরও ছিল। কিন্তু কোনভাবেই এটি বিস্ফোরণ ছিল না। আর এ কারণেই এ বিপ্লবের অনেকগুলো প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্য থাকাই স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে ইমামের বিপ্লব প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা থেকেও মার্জিত। কেননা প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো যে, প্রাকৃতিক বিষয়গুলো ধু এক নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটে থাকে। একটা ধাতু একই সাথে সোনা ও রূপা হতে পারে না। হয় সোনা হবে, না হয় রূপা। এ হলো প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু একটি সামাজিক বিষয়ে একই সাথে একাধিক প্রেক্ষিতের সমাবেশ সম্ভব।

ঘটনাক্রমে ইমাম হোসাইনের (আ.) বিপ্লবও এক বহু প্রেক্ষিত ঘটনা। কোনো কোনো বিপ্লব ও বিদ্রোহ কেবল প্রতিক্রিয়াধর্মী হতে পারে। প্রতিক্রিয়া আবার দু'ধরনেরঃ ইতিবাচক ও নেতিবাচক। কোনো কোনো বিপ্লব আবার কেবল সূচনাধর্মীও হতে পারে। ইমাম হোসাইনের (আ.) বিপ্লবে এ বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিটিরই উপস্থিতি দেখা যায়। আর এ কারণেই এ আন্দোলন বহু প্রেক্ষিতের রূপ নিয়েছে। প্রশ্ন হতে পারেঃ কিভাবে?

জবাবে বলতে হয়, প্রথম যে কারণটি কালক্রমে ইমামের আন্দোলনে অ ঘটক হয়েছিল তা হলো বাইয়াত প্রসঙ্গ । ইমাম (আ.) মদীনায় ছিলেন। মোয়াবিয়া স্বীয় পু ইয়াযিদের খেলাফত নিশ্চিত করার জন্যে মদীনায় এসে ইমামের কাছ থেকে ইয়াযিদের জন্যে বাইয়াত চায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়। মোয়াবিয়ার মৃত্যু পর ইয়াযিদ পুনরায় বাইয়াত নিতে ভয়ানক চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু ইমাম দেখলেন যে, এ বাইয়াত করার অর্থ কেবল মোয়াবিয়ার অনৈসলামী নীতি ও বিচ্যুতিকে মেনে নেয়া নয়, বরং ইসলামে আরেকটি নতুন বিদ'আত তথা 'রাজতন্ত্র'রও অ মোদন করা। এতদিন ইসলামে খলীফা নির্বাচনে দু'টো মতবাদ ছিল। একদল বলতো যে, আল্লাহর তরফ থেকে এবং রাসূলুল্লাহর বা ইমামের নিয়োগ ঘোষণার মাধ্যমেই খলীফা নিযুক্ত হবেন। আর কেউ কেউ বলতো যে, সাধারণ মা ষই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের খলীফা নির্বাচন করবে। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) যদি আজ এ বাইয়াত মেনে নেন তাহলে ইসলামের এই দুটো প্রচলিত মতবাদের অবসান হবে এবং খেলাফত এক নতুন ধারায় উত্তরাধিকার সম্পত্তি বা রাজতন্ত্রে রূপ নেবে যা ইসলামের দৃষ্টিতে নির্ঘাত বিদ'আত। মোয়াবিয়া প্রণীত এই বিদ'আত প্রথা প্রথমবারের মতো ইসলামে সংযোজিত হবে।

তারা ইমাম হোসাইনকে (আ.) বাইয়াত করতে কড়াকিড় আরোপ করে। অর্থাৎ এটা ইমামের জন্যে একটা প্রেক্ষাপট। এ প্রেক্ষাপটে তিনি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। ''তোমরা বাইয়াত চাও? আমি কোন মতেই তোমাদের হাতে বাইয়াত করবো না।'' ইমামের এ পদক্ষেপ তাকওয়া বা খোদাভীপ্রতিপ্রসূত। এটা সে জাতীয় পদক্ষেপ যা প্রত্যেক মা ষই সমাজে চলার পথে সম্মুখীন হয়। ভোগ- লালসা, খ্যাতির লালসা, পদলোভ, ভয়- ভতি প্রভৃতির রূপে এগুলো মা ষকে আক্রান্ত করে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে মা ষের কর্তব্য হল নেতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া। মা ষের কর্তব্য একটি 'না' বলা। অর্থাৎ সে তাকওয়াসম্পন্ন মা ষ।

তারা ইমামকে হত্যার ভয় দেখিয়ে বাইয়াত নিতে চাইল। ইমাম প্রাণ দিতে রাজী কিন্তু বাইয়াত করতে রাজী হলেন না। তিনি এখানে তাকওয়ার ভিত্তিতেই পদক্ষেপ নিলেন।

এ পর্যন্ত ইমামের আন্দোলন এক অবৈধ দাবীর বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ। অন্যকথায় তিনি 'লা ইলাহা'- এরই আ করণ করলেন এবং তাকওয়া রক্ষা করলেন।

কিন্তু ইমাম হোসাইনের বিপ্লবের কেবল এই একটিই কারণ ছিল না। আরও কারণ রয়েছে যাদের মধ্যে আরেকটির প্রেক্ষাপটেও ইমামের ভূমিকা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু এবার এ প্রতিক্রিয়া হল ইতিবাচক।

মোয়াবিয়া দুনিয়া ত্যাগ করলো। এর ২০ বছর আগে হযরত আলী (আ.) কুফায় পাঁচ বছর ধরে শাসন করেন। যদিও দীর্ঘ ২০ বছর ধরে মোয়াবিয়া কুফা থেকে হযরত আলীর (আ.) ছাপ মুছে ফেলার জন্যে বহু চেষ্টা- প্রচেষ্টা করেছে। আমর রুশাইদ ও সেইছামের মত হযরত আলীর (আ.) বিশিষ্ট্য সাহাবীদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তারপরও মোয়াবিয়ার শূন্যতার অবকাশ নিয়ে কুফাবাসীরা আজ পুনরায় হযরত আলীর (আ.) নামে সমবেত হয়েছে। এ যোগে তারা ইমাম হোসাইনের (আ.) যোগ্যতা ও বরকতময় অস্তিত্ব থেকে উপকৃত হবার জন্যে উদ্যোগী হল। তারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইমামকে চিঠি লিখল। তারা অন্তত কুফাতে একটি প্রকৃতত ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলো। তারপর ক্রমে সব জায়গাকে পুনরায় ইসলামী শাসনের ছায়াতলে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

ইমামের (আ.) জন্যে এ আবেদনটি হল তাদেরই পক্ষ থেকে, যারা তাদের ভাষায় জান- মাল দিয়ে ইমামকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তাদের চিন্তাজগতে পুনরায় বসন্ত এসেছে। তারা প্রকৃত ইসলামী শাসনধারা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছে।

কুফা প্রথম থেকেই মুসলিম সৈন্যদের নিবাস ছিল। হযরত উমরের আমলে কুফা শহরের প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে বেশীর ভাগ সৈন্যই বসত গড়ে তোলে। এ কারণে এ সময় কুফা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী শহরে পরিণত হয়।

এই কুফা শহরের জনগণ ইমামকে (আ.) সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দাওয়াত করছে। একজন নয়, দু'জন নয়, পাঁচজন, শতজন কিংবা এক হাজার নয়, প্রায় ১৮ হাজার দাওয়াতী চিঠি

ইমামের হাতে আসে। কোনো কোনো চিঠিতে ১০ থেকে ১০০ জনের স্বাক্ষর ছিল। তাই সব মিলিয়ে দাওয়াতকারী লোকের সংখ্যা প্রায় লাখের কাছাকাছি দাঁড়ায়।

এখানে ইমামের করণীয় কি হওয়া উচিৎ? কুফাবাসীদের পক্ষ থেকে যা করার ছিল তারা করেছে। বাকী কাজ ইমামের হাতে। বাইয়াতের প্রসঙ্গে ইমাম ধু একটি 'না' বললেই তাকওয়া রক্ষা এবং দায়িত্ব শেষ হতো। তারপর ইবনে আব্বাসের প্রস্তাব অ যায়ী যদি ইয়াযিদী বাহিনীর নাগালের বাইরে গিয়ে ইয়েমেনের এক পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করতেন তাহলে তিনি বাইয়াত করার চাপ থেকেও রক্ষা পেতেন।

কিন্তু এবারে একদল প্রভাবশালী মুসলমান রীতিমত বিদ্রোহ করে ইমামকে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করার আহবান জানাচ্ছে । এখানে অবশ্যই ইমামকে প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে ইতিবাচক, যদিও ইমাম হোসাইন (আ.) প্রথম থেকেই কুফাবাসীদের চপলমতি, দুর্বলচিত্ত, অপ্রস্তুত ও ভীত মানসিকতা দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু তারপরও ১৮ হাজার চিঠিতে প্রায় এক লক্ষ লোকের আবেদন, তারা এখন ইমামের অপেক্ষায় আছে। এখানে ইমাম (আ.) যদি কুফাবাসীদের আবেদনকে অগ্রাহ্য করতেন তাহলে আজ আমরাই যারা হোসাইন-হোসাইন করি, বলতাম, ইমাম (আ.) কেন এত বড় একটা ভুল করলেন?

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য । আব্বাসীয় খেলাফতকালে আবু সালামাহ খাললাল (যাকে আলে মুহাম্মদের উজীর বলা হতো) খলীফার সাথে যখন তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলো তখন ইমাম জাফর সাদেক (আ.) ও আব্দুল্লাহ মাহয কে দুটো চিঠি লিখে বললো, ''এতদিন আমি ও আবু মোসলেম এদের জন্যে কাজ করেছি, এখন চাই আপনার জন্যে কিছু করতে। সবকিছুই অ কূল আছে। এখন এসে কেবল আমাদেরকে সহযোগিতা করুন, আমরা এদেরকে হটিয়ে দেব।'' ইমাম জাফর সাদেক (আ.) এতে সাড়া দেননি। এখানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় :

এক : আবু সালামাহ মা একজন ছিল।

দুই : যেহেতু দু'জনের কাছে একই চিঠি পাঠিয়েছিল সেহেতু বুঝা যায় যে, তার উদ্দেশ্য নিষ্ঠাপূর্ণ ছিল না।

তিন : সে এমন এক সময় এ পদক্ষেপ নিয়েছিল যে, খলীফা বুঝতে পেরেছিল একে দিয়ে আর কোনো ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। তাই কয়দিন যেতে না যেতেই খলীফা তাকে হত্যাও করেছিল। ইমাম সাদেক (আ.) এসব দিকই ভালভাবেই অবগত ছিলেন। তাই আবু সালামাহর প বাহকের সামনেই তিনি তার চিঠি পুড়িয়ে ফেললেন। প বাহক বললোঃ চিঠির জবাব কি দেব?

ইমাম সাদেক (আ.) বললেন : এটিই হলো আবু সালামাহর চিঠির জবাব।

এই একজনের আবেদন অগ্রাহ্য করায় আজও বহু লোক ইমাম সাদিককে (আ.) দোষারোপ করে বলেন : কেন তিনি ইতিবাচক সাড়া দিলেন না?

আর যেখানে প্রায় লক্ষ লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত ১৮ হাজার চিঠি - তাও আবার ঐ চরম দুর্দিনে ইমাম হোসাইনের (আ.) হাতে পৌঁছায় তখন তিনি যদি সাড়া না দিতেন তাহলে অনন্তকালের ইতিহাস ইমামকে (আ.) দোষারোপ করে বলতো যে, যদি ইমাম তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে নেতৃত্ব দিতেন তাহলে ইয়াযিদ ও ইয়াযিদীরা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত।

কুফার শক্তিশালী সেনাবাহিনী দিয়ে অতি সহজেই ইমাম বিজয়ী হতে পারতেন। ইতিহাস ইমামকে ভীতু বলেও দোষারোপ করতো। বলতে, ইমাম (আ.) প্রাণ হারাতে হয় কিনা সে ভয়ে ঐরকম একটা বর্ণ যোগকেও হারালেন (নাউযু বিল্লাহ)। তাই ইমাম হোসাইনের (আ.) মত মহা পুরুষের জন্যে এ মুহূর্তে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখানো ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় ছিল না। এমন কি তিনি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার মানসিকতা জেনেও অন্তত পক্ষে যতক্ষণ তারা বাহ্যিকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি ততক্ষণ পর্যন্ত ইমামের (আ.) এটিই করণীয় ছিল। তারা প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করার পর ইমামের (আ.)ও আর কোনো করণীয় থাকতো না। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, অনেকে ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনে বাইয়াত ও দাওয়াত প্রসঙ্গের মধ্যে এ গোজামিল দেয়ার প্রচেষ্টা করেন। ইমাম হোসাইন (আ.) আগেই বিদ্রোহের ঘোষণা দেন, নাকি কুফাবাসীরা আগে ইমামকে দাওয়াত করে। ইমাম কি সাহায্য ও সফলতার আশ্বাস পেয়ে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নেন? এ নিয়ে অনেকেই বিভ্রান্তিতে পড়েন।

বিশেষ করে যারা হোসাইনী বিপ্লবকে খাটো করে দেখাতে চায় তারা বলে, কুফাবাসীদের দাওয়াত ও আশ্বাস পেয়েই ইমাম বিদ্রোহ করেন।

অথচ আমরা ইতোমধ্যেই অ ধাবন করতে পেরেছি যে, ইমামের আন্দোলন আসলে মোয়াবিয়ার আমলেই রু হয়। আর কুফাবাসীদের দাওয়াত কেবল ইমামের আন্দোলনের চুড়ান্ত রূপটি কারবালায় স্থানান্তরে সহায়তা করেছিল। তা না হলে কুফাবাসীরা যদি দাওয়াত নাও করতো তবুও ইমামের আন্দোলন অব্যাহত থাকতো এবং অন্য কোনো স্থানে তা পরিণতি লাভ করতো। ইয়াযিদের প্রচন্ড চাপে ইমাম ৬০ হিজরীর ২৭শে রজব মদীনা থেকে মক্কার পথে বের হন। তখনও পর্যন্ত কুফাবাসীরা এসব ঘটনার বিন্দুমা ও জানতো না। ইমাম ৩রা শাবান মক্কায় এসে পৌঁছান। মক্কাতে তিনি এক মাসেরও বেশী সময় ধরে ইসলাম প্রচার করেন। এর মধ্যে কুফাবাসীরা ইমামের বিদ্রোহ এবং মক্কায় আগমনের কথা অবগত হয়। এরপর ১৫ই রমজান তারিখে কুফাবাসীদের প্রথম দাওয়াতী চিঠি মক্কাতে ইমাম হোসাইনের (আ.) হাতে পৌঁছায়।

তরাং এখানে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কুফাবাসীদের দাওয়াত ইমামের বিপ্লবে একটা সাধারণ উপাদান ছিল এবং তা ইমামের বিদ্রোহ ঘোষণার পরেই সংযোজিত হয়েছিল।

কিন্তু তৃতীয় কারণটিই ছিল ইমাম হোসাইনের বিপ্লবের মূল স্লোগান। মদীনা থেকে রওয়ানা হবার দিন থেকেই তিনি এই স্লোগান ধ্বনিত করেন। এ সময় তিনি বাইয়াতের কোনো কথাই আনেননি। আর কুফাবাসীদের দাওয়াত প্রসঙ্গে কোনো কথা বলা তো সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কারণ সে ঘটনা ছিল দু'মাস পরে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, চারদিক ফ্যাসাদে ভরে গেছে, ইসলাম হুমকির সম্মুখীন, কোরআন হুমকির সম্মুখীন। তাই অন্য কোনো প্রসঙ্গ না আসলেও আমি কেবল শরিয়তী দায়িত্ব পালনার্থে এবং আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার করার জন্যেই অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে বিদ্রোহে নামতাম।

প্রথম কারণের প্রেক্ষাপটে ইমাম আত্মরক্ষা মূলক ভূমিকা নেন। দ্বিতীয় কারণের প্রেক্ষাপটে ইমাম সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু তৃতীয় কারণটির পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি হুকুমতের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছেন। তাদের অবৈধ কাজ

কারবারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এ হিসাবে ইমাম হোসাইন (আ.) একজন প্রতিবাদী, বিপ্লবী। তিনি সমাজে সংস্কার করতে চান।

এখান থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার'- কে কত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ইসলামের এই ভিত্তির ওপর দাড়িয়েই স্বৈরাচারী শাসকের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেন।

কুফার পথে তিনি দু'জন পথিককে কুফা থেকে আসতে দেখেন। তিনি তাদের সাথে আলাপ করতে চাইলেন, কিন্তু পথিকদ্বয় ইমাম হোসাইনকে (আ.) চিনতে পেরে নিজের পথে চলতে লাগলো। অতঃপর ইমামের একজন পিছনে পড়া সহযোগীর সাথে ঐ দুই পথিকের সাক্ষাত হয়। তারা ইমামের দূত মুসলিম ইবনে আকীল ও হানীর শাহাদাতের সংবাদ দিয়ে বললো : আমরা এ খবর ইমামের কাছে বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তারপর ইমামের এই সঙ্গী কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে ইমামের (আ.) কাছে গেল এবং বললোঃ আমার কাছে একটা খবর আছে। যদি চান তো এখানেই বলি আর নইলে ব্যক্তিগতভাবেই বলবো। ইমাম বললেনঃ আমি কোনো সংবাদ আমার সঙ্গী- সাথীদের কাছে গোপন রাখতে চাই না। কি খবর এখানেই বলো। ঐ ব্যক্তি ঘটনা ইমামকে জানালো এবং বললো : গতকাল যে দু'জনের সাথে আপনি আলাপ করতে চেয়েছিলেন তারা অন্য পথ দিয়ে চলে গিয়েছিল, তারাই আমাকে বললো যে, কুফার পতন ঘটেছে। মুসলিম ও হানীকে হত্যা করা হয়েছে। একথা নেই ইমাম কেঁদে ফেললেন। তারপর কোরআনের এই অমর বাণীটি উচ্চারণ করে বললেনঃ

(مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)

''মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিল তাদের একদল স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেছে। আর যারা এই প্রতিজ্ঞা পালন করেছে তাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছে এবং বাকীরা তাদের পালার অপেক্ষায় আছে।'' (আহযাবঃ ৩৪)

অর্থাৎ আমরা কেবল কুফার জন্যে আসিনি। কুফার পতন হয়েছে- তো কি হয়েছে? আমাদের দায়িত্ব অনেক উর্ধ্বে, অনেক মহান। মুসলিম ইবনে আকীল সফলতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে চলে গেছেন, তারা শাহাদাতের ধা পান করেছেন। এখন আমাদের পালা।

ইমাম হোসাইনের (আ.) আক্রমণধর্মী ভূমিকার কারণে তার চিন্তাধারাও ছিল আক্রমণধর্মী । অথচ যে আত্মরক্ষা করতে চায় তার চিন্তা ভিন্ন প্রকৃতির হয়। যেমন ধরুন কারও একটি মূল্যবান জিনিস আছে। ডাকাত চায় এটাকে ছিনতাই করতে। তখন ঐ মালিকের ভূমিকা যদি আত্মরক্ষা মূলক হয় তাহলে ডাকাতের হাত থেকে জিনিসটাকে রক্ষা করা হবে তার লক্ষ্য । সে হয়তো একটু শক্তি প্রয়োগ করলেই ডাকাতকে হটাতে কিংবা আহত করে ফেলতে পারতো। কিন্তু সে এ বিষয়ে একবারও না ভেবে বরং জিনিসটা নিয়ে দৌড়ে পালাতে চায়। এটা হলো তার আত্মরক্ষার মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু একজন আক্রমণধর্মী ভূমিকায় অবতীর্ণ ব্যক্তি কেবল নিজেকে রক্ষাই করে না, প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদও করতে চায়। এ জন্যে যদি নিজের প্রাণও দিতে হয় তবু সে পিছপা হয় না। এটি হলো আক্রমণধর্মী মানসিকতা। 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার' ইমামের চিন্তাধারাকে আক্রমণাত্মক করেছে। আর এই আক্রমণধর্মী মানসিকতা শহীদী মানসিকতায় পরিণত হয়েছে এবং শহীদী মানসিকতা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ।

শহীদী মানসিকতার অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তি তার সমাজের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চায় এবং তার এ বক্তব্য নিজর রক্ত দিয়ে লিখে যেতে চায়। দুনিয়াতে অনেকেই অনেক কিছু বলতে চায়। মাটির বুক চিরে কত ফলকই বেরিয়ে এসেছে যাতে হয়তো কোনো বাদশা লিখে গেছেঃ আমি অমুক, অমুকের ছেলে, আমি অমুক দেশেকে জয় করেছি, এত বছর জীবন যাপন করেছি, আমার এতগুলো স্ত্রী ছিল, আমি এত জুলুম অত্যাচার করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের এসব কথা যাতে মুছে না যায় সেজন্যে পাথের খোদাই করে রাখে।

অথচ তা কেবল পাথরেই থেকে যায়। মা ষের হৃদয়ে তার কোনো স্থান নেই। এমন কি শত বছর হাজার বছর পর যখন ঐসব ফলক উদ্ধার করা হয় তখন তা কেবল যাদু ঘরের এক কোণে জায়গা পায়, সাধারণ মা ষের কাছে তার কোনো মূল্য নেই।

কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) যা বলতে চেয়েছিলেন তা কোনো পাথরে খোদাই করে লেখেননি, বরং বাতাসের কাছেই তিনি তার বক্তব্য পেশ করেন। কিন্তু যেহেতু এ বক্তব্য রক্ত মিশ্রিত ছিল এবং রক্তও ছিল টাটকা লাল- তাই তা মা ষের হৃদয়ে এসে জায়গা করে নিয়েছে। এ কারণে আজও লক্ষ লক্ষ মা ষ সমস্বরে বলে ওঠেঃ

انى لا ارى الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمين

''যে জালেমদের সাথে বেঁচে থাকতে চায়, যে অপমানের জীবন যাপন করতে চায়, যে জীবনকে ধু দু'মুঠো খাবারের যোগান দিতে পারলেই সন্তুষ্ট থাকে, তাদের এই জীবনের চেয়ে মৃত্যু হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ।'' এ হলো শহীদের বাণী।

ইমাম হোসাইন (আ.) যেদিন কারবালার ময়দানে এই বাণী রেখে যেতে চেয়েছিলেন সেদিন কারবালার একমা স্ক গরম বাতাস ছাড়া কোনো কাগজও ছিল না, কলমও ছিল না। কিন্তু কেন তার বাণী জীবন্ত ? কারণ অনিতিবিলম্বে তা মা ষের হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এ বাণী হৃদয়ের কাগজে এমনভাবে লিখিত হয় যা হয়ে ওঠে চিরঅবিনাশী।

প্রতি বছর মুহররম আসে আর ইমাম হোসাইন (আ.) যেন নতুন করে জীবিত হন। তিনি পুনরায় বলে ওঠেনঃ মহান আল্লাহ আদমের (আ.) সন্তানদের ওপর মৃত্যুর দাগ এঁকে দিয়েছেন- যা তাদের জন্য সৌন্দর্য, যেমন যুবতীদের গলায় হারের দাগ (সৌন্দর্য)। আমি আমার পূর্ব পুরুষদের দেখার জন্যে অতি উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি যেমন ইউ ফকে দেখার জন্যে ইয়াকুব উদগ্রীব ছিলেন।''

শেষ মুহূর্তে যখন ইমামের সঙ্গীরা সবাই শহীদ হয়ে গেছেন, আর ওদিকে ৩০ হাজার তীর-তলোয়ার সজ্জিত শত্রু ঢেউয়ের মতো উথাল- পাতাল করছে তখনও ইমাম হোসাইন (আ.) বলেনঃ তোমাদের আমীর ঐ উবাইদুল্লাহ খবর পাঠিয়েছে যে, হোসাইনকে হয় তলোয়ার ধরতে হবে না হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে- এ দুটোর একটিকে বেছে নিতে হবে। হোসাইন কোথায়, আর এ নতি স্বীকার কোথায়?

هيهات منّا الذلّة

আল্লাহ আমার নত হওয়াকে পছন্দ করেন না। আমার রাসূল (সা.) আমার নত হওয়া পছন্দ করেন না। অনাগত কালের মুমিনরা চায় না যে, তাদের হোসাইন (আ.) অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করুক।

আর আমি হোসাইন নতি স্বীকার করবো? আমি শেরে খোদা আলীর (আ.) কোলে বড় হয়েছি, আমি রাসূলের (সা.) কন্যা ফাতেমার বুকের দুধ খেয়েছি। আমি নতি স্বীকার করবো?

এই শহীদী চিন্তাধারা এবং বহুমাি ক বিপ্লবের মানসিকতা থেকে ইমাম হোসাইন (আ.) এমন কি করে দেখিয়েছেন যা অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ বা চিন্তাধারা থেকে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। কেননা যদি ইমাম (আ.) কেবল আত্মরক্ষার মানসিকতায় থাকতেন তাহলে আ রার রাতে সঙ্গী সাথীদেরকে সব বুঝিয়ে তাদেরকে চলে যাবার অ মতি দেয়ার পর তারা যখন কেউই যেতে রাজী হল না, তখন ইমামের বলা উচিত ছিল : তোমরা আমার সাথে থাকতে পারবে না, ওরা ধু আমাকে চায়, আমি মাথা দেব কিন্তু ওদের হাতে হাত দেব না। এটা কেবল আমারই দায়িত্ব । তোমরা চলে যাও। এখানে থাকলে তোমাদেরও জীবনপাত ঘটবে। জীবন বাচানো ফরয। তরাং ধর্মমতে আমার সাথে থাকা তোমাদের জন্যে হারাম হবে।

না, এটা হতে পারে না। কারণ যে বিপ্লবী আক্রমণধর্মী ভূমিকায় নেমেছেন এবং তার বিপ্লবের বাণীকে টাটকা- তাজা রক্ত দিয়ে চির অমর করে লিখে যেতে চান তার জন্যে এ বিপ্লবের পিরিধ যতই উচ্ছল ও বিস্তৃত হবে ততই ভালো। আর এ জন্যেই দেখি যখন স্বাধীনভাবে ও সজ্ঞানে ইমামের (আ.) সঙ্গীরা নিজেদের প্রস্তুতি ঘোষণা করেন তখন ইমাম (আ.) 'হাত তুলে আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে দোয়া করেন। আ রার রাতে ইমাম (আ.) কেন হাবিব ইবনে মাযাহিরকে বলে পাঠালেন : দেখ, বনি আসাদের মধ্য থেকে কাউকে সত্য ও ঈমানের পথে আনতে পার কিনা? বনি আসাদীরা কতজনইবা ছিল? ধরুন, হুর গিয়ে একশ' জনকে বুঝিয়ে আনলো, তবু এই একশ জন ঐ ি শ হাজার বাহিনীর বিরুদ্ধে কি করতে পারতো? তারা কি পরিস্থিতি বদলে দিতে পারতো?- কখনোই না। তাহলে ইমাম কেন হুরকে এ কাজে পাঠালেন?

এখান থেকে বুঝা যায় যে, ইমামের (আ.) আক্রমণধর্মী শহীদী ও বিপ্লবী চিন্তাধারা এ বিপ্লবকে যথাসম্ভব বঞ্চিত করতে চেয়েছিল। আর এ কারণেই তিনি স্বীয় পরিবার- পরিজন ও আত্মিয় স্বজনকে সাথে করে নেন। তিনি জানতেন যে, তার এ বিপ্লবের বাণীর কথা তারাই মা ষের কানে পাঁছে দেবে। তাই, তিনি বিপ্লবই যখন করলেন তখন এমন এক বীজ বপন করে যেতে চাইলেন যা চিরকাল ধরে ফল প্রদান করবে, যা চিরকাল মুক্তি কামী সত্যান্বেষী মা ষের জন্যে আদর্শ হয়ে জ্বলবে। কারবালার ময়দানে অনেক হৃদয় বিদারক ও বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীর অবতারণা হয়। এগুলোই হোসাইনী আদর্শে চিরন্তন ও অমর আত্মা ফুকে দিয়েছে।

সবশেষে আরও একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই আলাচিত হয়েছে ‘‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’’- ইসলামের এই ভিত্তিই ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন করেছে। পক্ষান্তরে ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনও আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারকে অধিক গুরুত্ববহ ও উন্নীত করেছে। ব্যাপারটি স্বর্ণালংকার ও ন্দরী নারীর মতোই। সোনার অলংকার নারীদের সৌন্দর্য বাড়ায়। কিন্তু কোনো কোনো ন্দরী নারী আছে যারা খোদ স্বর্ণালংকারকেই সৌন্দর্য দান করে।

আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার সম মুসলমানের গর্বের বিষয়। পবি কোরআন বলছে ‘‘তোমরাই মানবতার জন্যে সর্বশেষ্ঠ উম্মত। কেননা তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে বাধা দাও।’’

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)

লক্ষ করুন, কোরআন মুসলমানদেরকে শেষ্ঠত্বের ঘোষণা করে কি ধরনের বাণী দিয়ে, এসব বাণী থেকে সত্যিই মা ষ আশ্চার্যান্বিত হয়? বলছেঃ

(خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)

তোমরাই মানবতার জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। কিন্তু কি জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ?

(تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)

কেননা তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো এবং অসৎ কাজে বাধা দাও। এই ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনীল মুনকার’ই আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ ও ধন্য করেছে। তাই বুঝতে হবে, যে সমাজে ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’ নেই সে সমাজ নামে মুসলমান হলেও শ্রেষ্ঠ উম্মত নয়।

কখনো কখনো একটা খুঁটিনাটি বিষয়কে নিয়ে আমরা ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারকে’ই প্রকৃত অর্থে উপহাস করি। কেউ যদি বলে, ভাই, সোনার অলংকার পুরুষদের জন্যে ব্যাবহার করা ঠিক নয়। আপনি ওটা খুলে ফেলুন। এটা তাও মানায়, কিন্তু কখনো কখনো কেবল দাড়ি রাখে না কেন এ নিয়ে রক্তারক্তি করে। এ ধরনের ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’ সত্যিই দুঃখজনক।

কারবালা ঘটনার দুই পিঠ

দেশও জাতির সেবায় যারা বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখে ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নামকে ‘‘বীর পুরুষ’’ হিসাবে অংকিত করে গেছেন, তারা নিজ দেশও জাতির কাছে শ্রদ্ধার পা । এ ধরনের ব্যক্তিদের খ্যাতি এক নির্দিষ্ট গো বা নির্দিষ্ট দেশের মা ষের মাঝেই সীমাবদ্ধ । তাদের অবদানও যেমন নির্দিষ্ট জেনগোষ্ঠির মাঝে, তেমনি ঐ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠিই তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। আবার বিশ্ব মঞ্চে যখন কোনো সম্মান লাভের প্রতিযোগিতা অ ষ্ঠিত হয় তখন প্রত্যেকটি লোক চায় তার দেশের জন্যে সম্মান বয়ে আনতে। অপরদিকে তার দেশবাসীও একমা তারই বিজয় কামনা করে। এই যে বীরত্বের আকাঙ্ক্ষা, এই যে নিজের দেশ বা জাতির জন্যে কিছু করা- এটা প্রত্যেক মা ষের এক সহজাত প্রবৃত্তি । কিন্তু এসবই এক নির্দিষ্ট ভুখণ্ড এবং এক নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মাঝে সীমাবদ্ধ ।

কখনো কখনো মা ষ দেশও জাতির সীমানা পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বকে কিছু দিতে চায়। তখন সে ধু নিজের দেশ কিংবা নিজের জাতিকে নয়, সমগ্র বিশ্বমানবতাকে সেবা করতে অসীম বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখে যায়। এ ধরনের ব্যাক্তিত্বকে কেবল তার নিজের জাতিই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে না, বিশ্বের সকল মা ষই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। মানবতা তাকে নিয়ে গর্ব করে। অবশ্য এ ধরনের ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে কমই খুজে পাওয়া যায়। ক’জনই বা এ কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছে?

এই ভুমিকাটুকু সেরে নিয়ে আমরা এখন ইমাম হোসাইনের (আ.) ব্যাক্তিত্ব ও হোসাইনী আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করে দেখবো। ইমাম হোসাইনের (আ.) স্মরণে আমরা পতি বছর অজস্র অর্থ ও বহু সময় ব্যয় করি, অফিস আদালত বন্ধ ঘোষণা করি। তিনি কি কোনো বীরত্বপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব ছিলেন নাকি ট্রাজেডি পূর্ণ ব্যাক্তিত্ব ? তিনি কি কোনো নির্দিষ্ট ভুখণ্ড ও জেনগোষ্ঠির, নাকি সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বমানবতার? বিশ্বমানবতা কি ইমাম হোসাইনকে (আ.) নিয়ে গর্ববোধ করে? সর্বোপরি বিশ্বমানবতা কিন্তু ইমাম হোসাইনকে (আ.) স্মরণ করে বীরত্ব অ ভব করে?

ইমাম হোসাইনের (আ.) ব্যাক্তিত্ব ও হোসাইনী আন্দোলনের ক্ষে এ- সব প্রশ্নের জবাবই ইতিবাচক। ইমাম হোসাইন (আ.) একজন বীরপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তা রূপকথার বীর রুস্তমের মতো নয়। ইমাম হোসাইনের (আ.) কথা, কাজ ঘটনাপ্রবাহ, তার বিপ্লবী সত্তা সব কিছুই মা ষকে অ প্রেরণা দেয়। মা ষের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে। এ- সব কিছুই মা ষের জন্যে শিক্ষণীয় ও অ করণীয়। কিন্তু এগুলোর কোনটাই নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা গো বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচ্য - পাশ্চাত্য, আরব- অনারব নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার জন্যে ইমাম হোসাইন (আ.) বীরত্ব ও গৌরবের।

আসলে ইমাম হোসাইনের (আ.) অস্তিত্বে কোনো সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে না। আর এই ব্যাপকতার কারণেই বিশ্ব আজও ইমাম হোসাইনকে (আ.) পুরোপুরি চিনতে ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু তার বীরত্ব সাধারণের অনেক উর্ধ্বে ছিল তাই স্বল্প সংখ্যক লোকই তা অ ধাবন করতে পারে। ইমাম হোসাইনের (আ.) মতো দেশও জাতির উর্ধ্বে একজন মহাবীর দ্বিতীয়টি খুজে পাওয়া যাবে না। ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন মানবতার বিজয় সংগীত। এ জন্যেই তিনি নজীরিবহীন, বিরল ব্যাক্তিত্ব একথা সাহসের সাথে বলা যায়। অদম্য শক্তি ও অসীম উদ্যমের কথাই হোক আর মহত্ব ও মানবতার কথাই আ ক- ইমাম হোসাইনের (আ.) মতো এরূপ আর দ্বিতীয় কেউ নেই। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় যে আমরা তা চিনতে পারিনি।

প্রকৃতপক্ষে আ রার ঘটনার দুটো পিঠ রয়েছে। এর এক পিঠ উজ্বল ও জ্যোতির্ময় এবং অন্য পিঠ কালো অন্ধকারে ভরা। এ উভয় পিঠই হয় দুর্লভ না হয় একবারেই বিরল। এ ঘটনার অন্ধকার পিঠ এ কারণেই বলা হয় যে, এ পিঠে কেবল জুলুম, অত্যাচার, অমা ষিকতা ও নির্মমতা ছিল, পৃথিবীতে যার জুড়ি মেলা ভার।

হিসাব করলে দেখা যায় যে, ঐ ইয়াযিদী অপকর্মে প্রায় ২১ ধরনের নিষ্ঠুরতা ও জঘন্যতা ছিল। দুনিয়াতে এমন আর কোনো ঘটনা আছে বলে মনে হয় না যাতে এত ধরনের জঘন্যতার সমাবেশ থাকতে পারে। ইতিহাস ক্রুসেডেরর পাশবিকতা, আন্দালুসিয়ার নির্মমতার মতো ঘটনাবলীকেও নিজের বুকে খোদাই করে রেখেছে। এসব ক্ষে ইউরোপীয়দের অমা ষিক নিষ্ঠুরতা প্রত্যেকটি

মা ষকেই হতবাক করে দেয়। মরহুম আয়াতীর ইতিহাসে ‘‘আন্দালুসিয়া’ নামক বইটি একটি বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ যা খুবই শিক্ষণীয়। এ বইতে আছে- ইউরোপীয়রা আন্দালুসিয়ার লক্ষাধিক নারী- পুরুষ ও শি কে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলে। হয়তো এটি তাদের এক যড়যন্ত্র ছিল কিংবা হয়তো তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে তারা অ তপ্ত হয়েছিল। তাই আন্দালুসিয়ার লক্ষাধিক মুসলমান যখন দেশ ছেড়ে রওনা হলো তখন ইউরোপীয়রা এদের সবাইকে জবাই করে হত্যা করলো। অবশ্য প্রাচ্যের কোনো অপরাধই পাশ্চাত্যের অপরাধকে ছাড়িয়ে যায়নি। যদি প্রাচ্যের ইতিহাসকে তন্ন তন্ন করে খোজা হয় তাহলে পাশ্চাত্যের অপরাধকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এমন কোনো অপরাধের সন্ধান মিলবে না। এমন কি উমাইয়া শাসকবর্গ বিভিন্ন ধরনের অপরাধে নিজেদের হাতকে কলূষিত করলেও অন্তত এ দুটো অপরাধ তারা করেনি। তার মধ্যে একটা হলো জীবন্ত পুড়িয়ে মারা এবং অপরটি পাইকারীভাবে নারী ও শি হত্যা। কিন্তু ইউরোপীয়রা এ দুটো অপরাধ করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। নির্বিচারে নারী হত্যা করা ইউরোপে এক অতি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়। আজও এরা যে মানবাত্মার অধিকারী এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। ভিয়েতনামে যে পাশবিকতা চালানো হয় তা ইউরোপীয়দের ক্রুসেড ও আন্দালুসিয়ার মানসিকতারই আর একটি স্বরূপ। লক্ষ লক্ষ মা ষকে আগুনের কুপে পুড়িয়ে মারা (তাদের কোনো দোষ থাকলেও) একমা বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমাদের পক্ষেই সম্ভব। পাচ্যের কোনো মা ষের পক্ষে এ ধরনের কাজ একবারে অসম্ভব।

খাদ্য ও পানীয় দেবার ভয়ে সিনা মরুভূমিতে হাজার হাজার সেনাকে অনাহারে মেরে ফেলার ঘটনা একমা পশ্চিমাদের দ্বারাই সম্ভব। প্রাচ্যবাসীরা এ ধরনের অপরাধ কখনোই করতে পারে না। ফিলিস্তিনী ইহুদীরা পশ্চিমা ইহুদীদের চেয়ে শত গুণে ভাল। যদি ফিলিস্তিনের ইহুদীরা মূল ফিলিস্তিনী হতো তাহলে কোনো রকম- সংঘাতই থাকতো না। আজকে ফিলিস্তিনে যে পাশবিকতা চলেছ তা ঐ পশ্চিমা ইহুদীদের হাতেই ঘটছে।

এ কারণে জোর করে বলা যায় না যে, কারবালার নিষ্ঠুরতার মতো দ্বিতীয় আর নেই। তবে প্রাচ্যের ইতিহাসে যে এ ধরনের ঘটনা বিরল একথা সাহসের সাথে বলা যায়।

এ দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করলে কারবালার ঘটনা একটি ঘটনা। ট্রাজেডি পূর্ণ হৃদয় বিদারক ঘটনা।

ঘটনার এ পিঠে আমরা নিরপরাধ মা ষকে নির্মমভাবে হত্যা, যুবক হত্যা, দুগ্ধ পোষ্য শি - হত্যা, লাশের ওপর ঘোড়া চালানো, তৃ ার্তকে পানি বঞ্চিত করা, নারী ও শি কে চাবুক মারা, বন্দীকে খালি উটের পিঠে চড়ানো ইত্যাদি নির্দয়তা দেখতে পাই। এখানে ঘটনার বীর নায়ক কে? এটি সর্বজন নিবেদিত যে, জুলুম অত্যাচারের দিক থেকে বিচার করলে যে অত্যাচারিত হয় সে তো বীর নয়, বরং সে মজলুম অসহায়। এ দৃষ্টিতে ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়াই হলো ঘটনার বিজয়ী বীর। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ, শিমার, এরাই হলো ঘটনার নায়ক। তাই কারবালার ঘটনার এ পিঠে কেবল মানবতার মুখে কালিমার ছাপ ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। এ পিঠে তাকালে শান্তি কামী মা ষ মা ই শোকে মুর্ছা যায়।

প্রকৃতপক্ষে ইমাম হোসাইনের (আ.) আ রার কি এই একটিই রূপ? এর কি আরেকটি দিক নেই?

হোসাইন (আ.) মানে কি কেবলই শোক, আফসোস আর দুর্দশা ?

আমাদের ভূল এখানেই। এ ঘটনার আরেকটি পিঠ আছে যেখানে ইয়াযিদ আর বিজয়ী নয়; ইবনে যিয়াদ, শিমার, ইবনে সা'দ সেখানে আর নায়ক নয়।

ওপিঠের নায়ক হলেন হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)। ওপিঠে আর কোন নিষ্ঠুরতা- পাশবিকতা নেই, বরং সেখানে কেবল বীরত্ব, গৌরব আর আলোর ছাড়াছড়ি। ম ষ্যত্ব, মানবতা, সত্য ও ন্যায়ের উজ্জ্বল আলোকে কারবালা ঘটনার সে পিঠ উদ্ভাসিত। সে পিঠে তাকালে বলতে হয় যে, সত্যিই মানবতা গর্ব করার অধিকার রাখে। কিন্তু অন্ধকার পিঠে তাকালে মানবতাকে পাশবিকতার হাতে পরাভূত হতে দেখা যায়। তখন কোরআনের এই আয়াতের বাস্তবতা খুজে পাওয়া যায়- আল্লাহ যখন মা ষ সৃষ্টি করতে চাইলেন তখন ফেরেশতারা অভিযোগ করে বলে উঠলোঃ

(قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ)

''আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতি ও পবি তা ঘোষণা করি।'' (সূরা বাকারাঃ ৩০(

উত্তরে মহান আল্লাহ বলেছিলেনঃ ''আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না।''

আসলে কারবালার ঐ পিঠ এমন যা দেখে ফেরশতারাও আল্লাহর কাছে আপত্তি তোলে, ঐ পিঠে মা ষ কলূষিত- মানবতা অপমানিত। কিন্তু ঘটনাটির এ পিঠ উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। এ পিঠ দেখে মানবতা গর্ববোধ করে। আমরা কেন সব সময় কারবালা ঘটনার কলুষময় পিঠের দিকে তাকাবো? কেন সব সময় ইমাম হোসাইনের (আ.) নিদারুণ অসহায়তার দিককেই স্মরণ করবো? আর কেনই- বা ইমাম হোসাইনের (আ.) বীরত্বকে উপেক্ষা করে তার অসহায়ত্বকে বড় করে তুলবো?

কারবালার ঘটনার উজ্জ্বল দিকটি এর কলুষময় দিকের চেয়ে শত- সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তাই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে যে এ ঘটনার ধু এক দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আমরা ইমাম হোসাইনের (আ.) মজলুমতাকে আরও বাড়িয়েছি। আজকে যারা ইমাম হোসাইনের (আ.) মহান লক্ষ্যকে ভালভাবে উপস্থাপন করে, তারাও সেদিনের ইয়াযিদের মতো ইমাম হোসাইনের (আ.) ওপর জুলুম করে।

একিদন ইমাম হোসাইনকে (আ.) হত্যা করা হয়, তার শিরচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু হোসাইন (আ.) তো কেবল ঐ দেহ কিংবা ঐ মাথা- ই নন, তিনি তো আপনার- আমার মতো নন যে, দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হলেই সব শেষ হয়ে যাবে।

হোসাইন (আ.) একটি আদর্শের নাম যিনি মৃত্যুর পরে আরও বেশী জীবন্ত হয়ে ওঠেন। বনি উমাইয়ারা ইমাম হোসাইন (আ.) কে হত্যা করে ভেবেছিল সবকিছু চুকে গেল। কিন্তু শীঘ্রই বুঝলো যে, জীবিত হোসাইনের (আ.) চেয়ে মৃত হোসাইন (আ.) তাদের পথে বেশী অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। অ ভূতিসম্পন্ন প্রত্যেকটি মা ষের অন্তরের মণিকোঠায় ইমাম হোসাইন (আ.) বেঁচে রইলেন এবং তাদেরকে সৎ কাজে উদ্যমী ও অসৎ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার চিরন্তন

অ প্রেরণা যোগালেন। হযরত জয়নাবও (আ.) ইয়াজিদকে একথা স্পষ্ট করে বলে দেন। তিনি বলেন, তোমরা ভুল করলে।

كد كيدک و اسع سعيک، ناصب جهدک فوالله لا تمحوا ذكرنا و لا تميت و حينا

তোমার যে মতলব বা ফন্দী আছে তা সবই করে যাও, তবে জেনে রেখো যে, আমার ভাইকে তোমরা কখনো মারতে পারবে না। আমার ভাইয়ের জীবন অন্য ধরনের। সে মরেনি, বরং আরও জীবন্ত হয়েছে। সে জীবনের নতুন মা া পেয়েছে। (বিহারুল আনওয়ার ৪৫১৩৫/; লুহুফ৭৭ -)

হযরত জয়নাবের (আ.) একথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। স্বৈরাচারী শাসকমহল দেখলো যে, একজন ইমাম হোসাইনের (আ.) রওজা থেকে এখন হাজার হাজার হোসাইন জন্ম নিচ্ছে । বিপদ বুঝতে পেরে এবার তারা ইমাম হোসাইনের কবরকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যোগী হল। তারা কবরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে সেখানে পানির স্লোত চালিয়ে দিল যাতে কেউ তা আর খুজে না পায়। কিন্তু তারা কি সত্যকে ঢেকে রাখতে পারলো ? বরঞ্চ তা মা ষকে বেশি বেশি আকর্ষণ করতে লাগলো।

ইমাম হোসাইন (আ.) মজলুম অবস্থায় নিহত হয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যদি তার মজলুম অবস্থাকে স্মরণ করার সময় তার মহান লক্ষ্য ও বীরত্বের কথাকে ভুলে যাই তাহলে এটি ইমাম হোসাইনের (আ.) প্রতি এক ধরনের জুলুম করা হবে। তাই, ইমাম হোসাইনের (আ.) শাহাদত দিবসে শোক পালনের পাশাপাশি তার অসীম বীরত্বকেও একবার স্মরণ করা উচিত যাতে আমরাও তার পথে চলতে পারি। আমরা মিথ্যা প্রলোভনের তোয়াক্কা না করে সত্যকে নিয়েই বাচতে পারি, সত্যকে নিয়েই মরতে পারি। আমরাও যেন কোন প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের সাথে আপোস না করে প্রাণ দিয়ে হলেও অত্যাচারীকে উৎখাত করতে পারি। আমরাও যেন ম ষ্যত্বের মর্যাদা, মানবিক মূল্যবোধ, সততা, সাহস, দয়া, মায়া, ইজ্জত ইত্যাদি গুণগুলোর প্রতি যথার্থ মর্যাদা দিতে পারি এবং এগুলো দিয়ে আমাদের আত্মাকে পরিপূর্ণ সত্তায় রুপান্তরিত করতে পারি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কারবালা- ঘটনার উজ্জ্বল পিঠটির দিকে তাকাবো ততক্ষণ আমরা এগুলো উদঘাটন করতে পারবো না।

জনৈক লেখক ইমাম হোসাইন (আ.) ও হযরত ঈসা মসীহর মধ্যে তুলনা দিয়ে লেখেন, ‘‘মুসলমানদের কার্যকলাপের চেয়ে খ্রীষ্টানদের কার্যকলাপ অধিকতর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। কেননা খ্রীষ্টানরা ঈসা মসীহর শাহাদাতের দিনে আনন্দ উৎসব পালন করে, অথচ মুসলমানরা ইমাম হোসাইনের (আ.) শাহাদাতের দিনে শোক মিছিল ও কান্নাকাটি করে থাকে। খ্রীষ্টানরা ঈসা মসীহর শাহাদাতকে বিজয় মনে করে- পরাজয় নয়। তাই তারা বিজয় উৎসব পালন করে। কিন্তু মুসলমানরা শাহাদাতকে পরাজয় মনে করে, তাই ইমাম হোসাইনের (আ.) শাহাদাত দিবসে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের শোকে কান্নাকাটি করে ও মার্সিয়া পড়ে। ধন্য হোক সেই জাতি যাদের কাছে শাহাদাত বিজয় খ্যাতি লাভ করেছে আর কত নীচু সেই জাতি যাদের কাছে শাহাদাত পরাজয় ও ব্যর্থতা বলে বিবেচিত।’’

এ বক্তব্যের জবাবে বলতে হয়ঃ

প্রথমত খ্রীষ্টানরা ঈসা মসীহ নিহত হয়েছেন- এই ভুল বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই তার মৃত্যুর দিনে আনন্দ উৎসব পালন করে। তারা মনে করে হযরত ঈসা (আ.) নিহত হয়েছেন তাদের পাপের বোঝা নিজের কাধে তুলে নেয়ার জন্যে । আর যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) তাদের সমস্ত পাপের জামিন হয়ে তাদের মাথার বোঝা খালি করে দিয়েছেন- (এখন থেকে তারা যত ইচ্ছা পাপ করবে কোনো ভয় নেই, হযরত ঈসা তাদেরকে বাচাবে) এই কু- ধারণাবশতই খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসার প্রতি খুশি হয়ে তার মৃত্যু দিবসে আনন্দ উৎসব করে। অথচ তাদের এ ধারণা অবশ্যই একটা ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত ধারণা।

দ্বিতীয়ত এটি ইসলাম ধর্ম এবং ‘‘মা ষের হাতে বিকৃত’’ খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে একটি পার্থক্যের বহিঃপ্রকাশও বটে। ইসলাম এক সামাজিক ধর্ম, অথচ বর্তমানে বিভ্রান্ত খ্রীষ্ট ধর্ম মা কয়েকটি নৈতিক উপদেশ। এর বেশি কিছু নয়।

তাছাড়া কোনো ঘটনাকে এক সময় ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়, আবার কখনও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে ইমাম হোসাইন (আ.)

ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই বিজয়ী ও সফল হয়েছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) নিজেও সেই প্রথমদিনই নিজের সফলতা ঘোষণা করে বলেনঃ

‘‘মহান আল্লাহ আদমের (আ.) সন্তানদের ওপর মৃত্যুর দাগ একে দিয়েছেন যা তাদের জন্য সৌন্দর্য, যেমন যুবতীদের গলায় হারের দাগ।’’ (দ্রঃ বিহারুল আনওয়ার ৪৪আল ৩৬৬/- লুহুফঃ ২৫, মাকতালুল হোসাইনঃ খারাযমীঃ ২(২৯/২ কাশফুল গোম্মাহঃ ৫/

خط الموت على ولد آدم مخط القادة على جيد الفتاة، و ما اولهنى الى اسلافى اشتياق يعقوب الى يوسف

মা ষের দৃষ্টিতে এবং স্বয়ং শহীদের দৃষ্টিতেও শাহাদাত এক বিজয়। একথা খ্রীষ্টানদের বলে দিতে হবে না। ইসলামের নেতারা আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই তা ঘোষণা করে গেছেন। তবে এ হলো ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ। ইসলামের আরও এক দৃষ্টিকোণ রয়েছে। ইসলাম কোনো ঘটনাকে কেবল ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করে না, বরং সামাজিক ও সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করে দেখে। সামাজিক ও সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা কারবালা ঘটনায় অপরাধী, তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে এক জাতির অধঃপতনের কথাই ধরিয়ে দেয়। এজন্যে সব সময় এ স্মৃতিকে স্মরণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি না হয়। আজ মুসলমানরা যে শোকা ষ্ঠান করে তা তাদের অতীতের মুর্খতা ও ভুলের থেকে উৎসারিত আফসোস বৈ কিছুই নয়। মুসলমানরা বলতে চায়, হায়! তারা এমন নৃশংসতা করেছে? যারা একাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিক।

দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে মুসলমানদের ইসলামী তথা মানিবক অ ভূতি ও মূল্যবোধকে কোমলতর ও প্রগতিশীল করা যায়। আমরা আমাদের ধর্ধীয় চেতনাবোধেকে সব সময় জাগ্রত রাখতে পারি। এমন কি আমাদের ব্যক্তিগত কর্মজীবনেও সত্য ও সঠিক পথ ধরে এগিয়ে যেতে অ প্রেরণা লাভ করি। অন্যায়- অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে সাহস পাই। নিজেদের ভুল- ত্রুটি ধরে নেবার যোগ পাই।

তাই সংক্ষেপে বলা যায় যে, কারবালা ঘটনার দু’টি পিঠ রয়েছে। এক পিঠে জুলুম, অত্যাচার, মানবতার অবমাননা যা দেখে ফেরেশতাকুল আল্লাহর কাছে আপত্তি তোলে।

কিন্তু আরেকটি পিঠ আছে যেখানে আছে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব, সৎ সাহস, একত্ববাদ, দৃঢ় ঈমান, ত্যাগের শিক্ষা, ধৈর্য, সহি ু, আরও একাধিক শংসনীয় গুণের সমারোহ। ওদিক থেকে দেখলে হযরত ইমাম হোসাইনই বীরশ্যেষ্ঠ, শহীদ শ্যেষ্ঠ । তিনি একটি ''হোসাইনী আদর্শ'' মা ষের সামনে রেখে গেছেন যে আদর্শে মুসলমান- অমুসলমান নির্বিশেষে সকল মা ষের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। যে পিঠ দেখে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন- তোমরা সবকিছু জান না। তোমরা কেবল মা ষের অধঃপতনের দিক দেখতে পাচ্ছ । কিন্তু 'আমি যা জানি তা তোমরা জান না।' আমি জানি মা ষ সত্য ও ঈমানের জন্যে কত বড় আত্মত্যাগ করতে পারে। নিজের জান- মাল সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে সত্যকে রক্ষা করতে পারে। এখানে এসে মা ষ আত্মত্যাগী, মহাবীর। এখানেই তারা আমার উপযুক্ত প্রতিনিধি। আর আমাদের উচিত ইমাম হোসাইনের (আ.) ওপর ইয়াযিদীদের অবর্ণনীয়- অত্যাচারের পাশাপাশি হযরত ইমাম হোসাইনের ঈমান, বীরত্ব, সৎ সাহস, ত্যাগ, সহি ুতা ইত্যাদি বিষয়গুলোও স্মরণ করা। ইমাম হোসাইনের (আ.) জন্যে চোখের অশ্রু এজন্যে ঝরাবো যাতে আমরাও তার মতো ঈমানদার ও সত্যের অ সারী হতে পারি। আমরাও একমা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই নিজেদের জান- মাল সবকিছুকে উৎসর্গ করে দিতে পারি। আমাদের কান্না নে হযরত ফাতেমার (আ.) সন্তান হারানোর শোক কমে যাবে- এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে কেউ যদি ধু আ রার দিনে দু'মিনিট কেদে পার করে দেয় তাহলে অবশ্যই ভুল করবে। কেননা ইমাম হোসাইন (আ.), হযরত ফাতেমা (আ.), মহানবী (আ.) আমাদের এই পাপিষ্ট চোখের দু'ফোটা পানির প্রতি কোনো মুখাপেক্ষী নন। তারা এসবের অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। তাদের দায়িত্ব সফলতার সাথে এবং যথার্থভাবে পালন করে চলে গেছেন। এখন আমাদের পালা। হোসাইনী আদর্শ থেকে আমরা নিজেরাই উপকৃত হবো। আমাদের ঈমানেক দৃঢ় করবো। তাহলেই মহানবী (সা.) ও ইমাম হোসাইনের (আ.) উদ্দেশ্যও যথাযথ বাস্তবায়িত হবে। কেবল তখনই আমরা ইমাম হোসাইনের (আ.) শহীদী রক্তের উপযুক্ত মূল্য দিতে সক্ষম হবো।

কারবালার ঘটনা পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তব প্রতিফলন

কোন কোন বাক্য আছে যার একই সাথে একাধিক অর্থ করা যায় এবং প্রতিটি অর্থই সঠিক বলে গণ্য হয়। কারবালার ঘটনা ও ঠিক তেমনি একটি বহু অর্থবোধক ঘটনা। তাই এ ঘটনারও একাধিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এ কারণে আমরা দেখি যে, কারবালার ঘটনা নিয়ে অনেক ধরনের মতবাদই পেশ করা হয়েছে। কেউ কেউ এ কে একটা মর্মান্তিক ও বিষাদময় ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করেছেন, কেউ কেউ এটিকে ইমাম হোসাইনের (আ.) অসীম বীরত্বের পরিচয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার, কেউ এটিকে স্রেফ এক রাজনৈতিক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এ থেকে কারবালা ঘটনাটির বহুমাি কতা সহজেই ধরা পড়ে। তাই এ ঘটনা সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত হলেও হয়তো তাদের ব্যাখ্যাগুলোর কোনটাই মিথ্যা নয়। তবে এ ব্যাখ্যাগুলোর কোনটিই এককভাবে কারবালা ঘটনাকে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গিই এ ঘটনার একটি দিককে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাপারটি ঠিক ছয় অন্ধের হাতি দেখার কাহিনীর মতোই বলা যায়। ছয় অন্ধের মধ্যে যে হাতির কান ধরেছিল সে মনে করলো হাতিটি পাখার মতো, যে হাতির পা ছুয়েছিল সে ভাবলো হাতিটি খুঁটির মতো। আর যে হাতির ড় ধরেছিল সে ভাবলো হাতি এক মোটা দড়ির মতো। একিদক থেকে বিচার করলে তাদের প্রত্যেকের এই ধারণা সঠিক ছিল। তারা হাতির যে অঙ্গগুলো ছুয়েছিল সেগুলো সত্যিকার অর্থে পাখা, খুঁটি কিংবা মোটা দড়ির মতোই ছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ অর্থে তাদের এ ধারণাগুলো যথেষ্ট নয়। কেননা হাতির পরিপূর্ণ রূপটি তাদের কেউই চিহ্নিত করতে পারেনি, বরং হাতির এক আংশিক রূপকেই তারা তুলে ধরেছে।

কারবালার ঘটনা ও যে পরিপূর্ণ ও আসল চেহারায় কেমন ছিল, স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তা উদঘাটন করতে পেরেছেন। আর অধিকাংশ ব্যক্তিই কারবালা ঘটনার একটি দিক বিশেষকে নিয়ে মূল্যায়ন করেছেন। এতক্ষণ ধরে আমরাও যে এটিকে একটি আন্দোলন বা একটি বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছি সে ও ছিল কারবালার ঘটনার একটি দিক মা । ইমাম হোসাইনের (আ.) ধু বিদ্রোহ

বললে তা সীমিত ও অংশবিশেষের অর্থকে প্রকাশকরে। তরাং আন্দোলন, বিদ্রোহ, বিপ্লব এ শিরোনামগুলোর পরিবর্তে ‘‘কারবালার ঘটনা’’ এ শিরোনাম ব্যাবহার করতে পারি। তাহলে হয়তো কারবালার ঘটনার সব ক’টি দিককে শামিল করা যেতে পারে।

আমরা যদি পরিপূর্ণ ইসলামকে বাস্তবে দেখতে চাই তাহলে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর এই মহান বিপ্লবের দিকেই তাকাতে হবে। তিনি কারবালার ময়দানে ইসলামের বাস্তব চি একেছেন, দক্ষ শিল্পীর মতো তিনি ইসলামকে প্রতিমূর্ত করেছেন। এ জীবন্ত ও প্রাণবন্ত । কোনো প্রাণহীন ও স্ক প্রতিমূর্তির মতো নয়। তাই এ ঘটনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই যে কোনো অ ভূতিসম্পন্ন মা ষই নিজের অজ্ঞাতে বলতে বাধ্য হবে যে, এটি কোন সহসা ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়, বরং ক্ষচিন্তা ও পরিকল্পনামাফিক এক আদর্শিক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে কারবালায়। আর এ আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং নবীদৌহি এই ইমাম হোসাইন (আ.)। তাই প্রতি বছর এই হোসাইনী আদর্শকে সঠিক মূল্যায়ন ও উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলামের এই জীবন্ত মুর্তিকে অক্ষয় রাখা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য ।

কারবালার ঘটনায় নারী- পুরুষ, শি - বৃদ্ধ, কালো- ধলো, আরব- অনারব, অভিজাত- গরীব সবারই ভূমিকা রয়েছে। যেন ইসলামের পরিপূর্ণ চেহারাটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে মহান আল্লাহর দক্ষ হাত দিয়ে নকশা আঁকা হয়েছিল! এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ ঘটনায় নারীর ভূমিকা বলতে কেবলমা হযরত জয়নাবের ভূমিকা ছিল তা নয়। তিনি ছাড়াও একাধিক মহিলা এ ঘটনায় ভূমিকা রেখেছিলেন। এমন কি কারবালার শহীদদের মধ্যে একজন নারীও ছিলেন। এছাড়া আরও দু’জন মহিলা রীতিমত যুদ্ধের ময়দানে চলে আসেন। পরে অবশ্য ইমাম হোসাইন (আ.) তাদেরকে ফিরিয়ে আনেন। অনেক মহিলাই এ ঘটনায় সাহসী ভূমিকা রাখেন এবং কত মা তাদের নিজের সন্তানকে স্বহস্তে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেন।

এ অধ্যায়ে আমরা কারবালা ঘটনার এক সার্বিক ও সামষ্টিক চি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবো।

এ ঘটনার তৌহিদী, আধ্যাত্মিক ও পবি তার দিকগুলো তুলে ধরতে মক্কায় উচ্চারিত ইমাম হোসাইনের (আ.) বক্তৃতার এ দুটো লাইনই যথেষ্ট বলে মনে করি। তিনি বলেনঃ

رضى الله و الله رضانا اهل البيت

‘‘আমরা নিজেরা কিছু পছন্দ করি না। আল্লাহ আমাদের জন্যে যেটা পছন্দ করেছেন সেটিই আমাদের পছন্দ অর্থাৎ আল্লাহর পছন্দই পছন্দ । আল্লাহ আমাদের জন্যে যে পথ নির্বাচিত করেছেন আমরা সে পথকেই পছন্দ করি।’’ (বিহারুল আনওয়ারঃ ৪৪৩৬৭/, মাকতালুল মোকাররামঃ ১৯৩, আল লুহুফঃ ২৫, কাশফুল গোম্মাহঃ ২(২৯/

ইমাম হোসাইনের (আ.) জীবনের শেষ মুহুর্তের কথাগুলোতেও এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। একটির পর একটি তীরের আঘাতে ইমাম হোসাইন (আ.) যখন ক্ষত- বিক্ষত হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়েন এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান সে সময়ে বলেনঃ

رضا بقضائک و تسليما لامرک، و لا معبود سواک، يا غياث المستغيثين

‘‘(হে আল্লাহ) আপনার বিচারে আমি সন্তুষ্ট এবং আপনার আদেশর প্রতি আমি আত্মসমর্পিত। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, হে অসহায়দের সহায়।’’ (মাকতালুল মোকাররামঃ ৩৫৭)

ইমাম জাফর সাদেক (আ.) বলেনঃ তোমরা ফরয ও নফল নামাযে সূরা আল- ফাজর পড়ো। এ সূরাটি আমার পূর্ব পুরুষ হযরত ইমাম হোসাইনের (আ.) সূরা। জিজ্ঞেস করা হলোঃ কী উপলক্ষে এটি আপনার পূর্ব পুরুষ ইমাম হোসাইনের (আ.) সূরা? ইমাম জাফর সাদেক (আ.) বললেন, এ সূরার শেষ আয়াতটির বাস্তব রূপ ইমাম হোসাইন (আ.)। আয়াত হলোঃ

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي)

‘‘হে প্রশান্ত চিত্ত ! তুমি সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে তোমার প্রভূর কাছে ফিরে এসো। অত:পর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।’’ (আল২৭ ফাজরঃ -- ৩০)

আ রার পবি রাতটুকু কী অবস্থায় কাটালেন ইমাম হোসাইন (আ.)! তিনি কেবল নামায, দোয়া, কালাম, কোরআন মজীদ তেলাওয়াত, আল্লাহর সাথে শেষবারের মতো অ নয়-বিনয় করার জন্যেই এই রাতটি অবসর চেয়ে নিয়েছিলেন। এমন কি আ রার দিনেও ইমাম হোসাইনের (আ.) পরম ভক্তি ও স্বস্তিতে নামায পড়ার মধ্যে এ ঘটনার তৌহিদী ও ইবাদতী

দিকটি ও চরমভাবে প্রকাশ পায়। আগেও উল্লিখিত হয়েছে, ইমাম হোসাইন (আ.) তার নিকটাত্মীয় স্বীয় ও বেশ কিছু সঙ্গী- সাথী আ রার দিনে দুপুরের পর থেকে শহীদ হন। পরে যখন নামাযের সময় হলো তখন আবু আস- সায়দাবী নামক একজন সঙ্গী এসে ইমাম হোসাইনকে (আ.) বললেনঃ হে রাসূলুল্লাহর (আ.) সন্তান! আমাদের জীবনের শেষ আরজ হলো শেষবারের মতো আপনার পিছনে দাড়িয়ে একবার জামাআতে নামায পড়বো। চারদিক থেকে যখন বৃষ্টির মতো তীর আসছে তখন ইমাম হোসাইন (আ.) মরুভূমির মাঝখানে অবশিষ্ট গুটিকতেক সঙ্গী-সাথী নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। যেন আল্লাহর ধ্যানে ডুবে গেলেন! পৃথিবীতে কী হচ্ছে তা তাদের জানা নেই। একবার চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এ নামায কি নামায ছিল! একজন ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকও বলেনঃ ঐ মুহূর্তেও ইমাম হোসাইন (আ.) এমন নামায পড়লেন দুনিয়াতে যার কোনো নজীর নেই।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখা যাবে যে, ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলন একটি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আন্দোলন। এখানে একমা লিল্লাহিয়াত এবং নিষ্ঠা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। একদিকে কেবল ইমাম হোসাইন (আ.) এবং অপর দিকে আল্লাহ। এর মধ্যে অন্য কারো আনাগোনা নেই।

যদি আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, ইমাম হোসাইন (আ.) এমন একজন অটল ও দৃঢ়সংকল্প বিদ্রোহী যিনি অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী অবৈধ শাসক মহলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন যাকে কোনো উপায়েই অবদমিত করা সম্ভব নয়। তার মুখ থেকে যেন অগ্নিবাণী বের হচ্ছে, একাধারে যিনি মান, সম্মান, মুক্তি, স্বাধীনতারও দাবি জানাচ্ছেন। তিনি বলেছেনঃ

‘‘আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, কক্ষোণই আমি তোমাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না কিংবা দাস দাসীদের মতো পালিয়েও যাব না। এ কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব। -

هيهات منّا الذلّة-

“নতি স্বীকার আমাদের মানায় না।’’

তিনি আরো বলেনঃ

لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما

‘‘আমি মৃত্যুর মধ্যে কল্যাণ ছাড়া অর কিছুই দেখি না এবং অত্যাচারীদের সাথে বেঁচে থাকার মধ্যে অপমান ছাড়া আর কিছুই দেখি না।’’

এসব বজ্র বাণী একই স্থানে বলেছেন। এগুলোর দিকে তাকালে ধু সাহস, বীরত্ব, দৃঢ়তা এবং আরবদের ভাষায় অসম্মতি ও অস্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছুই চোখে পড়ে না। ইবনে আবীল হাদীদ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি বলছেন, ইমাম হোসাইন ‘সাইয়েদুল ইবাতسيّد الاباة অর্থাৎ যারা জোর-জুলুমের কাছে নতি স্বীকার করে না তাদের সরদার। এখানে কেবলই প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, হুমকি আর অস্বীকৃতি।

কিন্তু অন্য আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখা যাবে যে, ইামাম হোসাইন (আ.) প্রকৃতই একজন শান্তিকামী, মঙ্গলকামী। এ দৃষ্টিতে তিনি এমন একজন ব্যক্তি যে তার শত্রুদের দুর্ভাগ্য ও অধঃপতন দেখে কষ্ট অ ভব করেন। তাদের জাহান্নামে যেতে দেখে তিনি নিজেই উদ্বিগ্ন হন। এখানে এসে বীরত্বের দুর্দমতা একজন শান্ত উপদেশদাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এমন কি আ রার দিনেও ইমাম হোসাইন (আ.) ও তার সঙ্গীরা শত্রুদের কি পরিমাণ উপদেশ দিয়েছেন! তাদের দুর্গতি দেখে ইমাম হোসাইনের (আ.) পবি অস্তিত্ব কষ্ট অ ভব করে। তিনি চান এখনই যেন তাদের টনক নড়ে এবং সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে পরি াণ লাভ করে। এমন কি একটি লোকও এই দুর্গতির আগুনে পুরে মরুক এটি ইমাম হোসাইন (আ.) দেখতে চান না। ইমাম হোসাইন (আ.) তার নানার উদাহরণ ছিলেন। সূরা তাওবার ১২৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছেঃ

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)

‘‘তোমাদের বিপদগামিতা তার (রাসূলের) জন্যে খুবই কষ্টদায়ক। সব সময় তোমাদের মঙ্গল চান।’’

অথচ ইয়াযিদী বাহিনী বুঝতে পারে না যে, তাদের এ দুর্গতি ইমাম হোসাইন (আ.)-এর জন্যে কত কষ্ট দায়ক! কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) কিভাবে এ কষ্ট দুর করবেন? তিনি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন। পুনরায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই পাগড়িটা মাথায় পরে নিলেন।

এবার তিনি ঘোড়ায় চড়ে শত্রুদের কাছে আসলেন। যদি একজনকেও এই আগুনের অভিযা ী বাহিনী থেকে মুক্তি দেয়া যায় এই আশায় তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও চেষ্টা ছাড়েননি। এ দৃষ্টিতে ইমাম হোসাইন (আ.) কত দরদী বন্ধু ! তার মধ্যে কতই ভালবাসা- মহববত। এমন কি, যে শত্রুরা একটু পরেই তাকে হত্যা করবে তাদেরকেও তিনি সত্যিই ভালবাসেন।

এবার ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করা যাক।এ দৃষ্টিতে দেখেল মনে হবে যে, কারবালার ঘটনায় ইসলামের চরি অংকিত হয়েছে। সংক্ষেপে আমরা কারবালার ঘটনার তিনটি নৈতিক গুনের দিকে দৃষ্টিপাত করবঃ পৌরুষত্ব, ত্যাগ ও বিস্বস্ততা।

প্রথমত ‘পৌরুষত্ব ’- শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। এ অর্থ সাহসিকতার চেয়েও উর্ধ্বে। খন্দকের যুদ্ধের সময় আরবের নামকরা যোদ্ধা উমর ইবনে আব্দুদের সামনে যখন কেউ আসতে সাহস পায়নি তখন হযরত আলী (আ.) এগিয়ে গেলেন। এ ছিল হযরত আলীর (আ.) সাহসিকতার পরিচয়। কিন্তু উমর ইবনে আব্দুদকে ধরাশায়ী করে হযরত আলী (আ.) যখন তার বুকে চেপে বসলেন এবং ইবনে আব্দদু ক্রোধের চোটে হযরত আলীর (আ.) মুখে থুতু নিক্ষেপ করলো তখন হযরত আলী (আ.) তার বুক থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর তিনি শান্ত হয়ে ফিরে এলেন। এই বীরত্বকেই পৌরুষত্ব বলে। ঠিক তেমনিভাবে ইমাম হোসাইন (আ.) যে ঐ মুহুর্তেও পিপাসার্ত শত্রুকে পানি দান করলেন- এর অর্থই পৌরুষত্ব । আ রার দিন ভোরবেলায় সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি ইমাম পরিবারের তাবুর দিকে আসে সে ছিল শিমার। শিমার তার পিছন দিক থেকে এসে দেখলো যে, তাবুগুলো সব মুখোমুখি করে গাড়া হয়েছে এবং এর পিছন দিকে পরিখা খনন করে তার মধ্যে কাটাযুক্ত কাঠ জমা করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। এ অবস্থা দেখে শিমারের পিছন দিক থেকে অতর্কিতে হামলা করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং সে তখন অশালীন ভাষায় গালি- গালাজ রু করে। শিমারের ব্যাবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর একজন সঙ্গী এসে বললেনঃ হে ইমাম ! আপনি অ মতি দিন, আমি একটি তীরের আঘাতে ওকে পরপারে পাঠিয়ে দিই। ইমাম (আ.) বললেনঃ ‘‘না। সঙ্গী বললেনঃ আমি ওকে চিনি। ও কি জঘন্য জাতের

লোক, কত বড় ফাসেক ও লম্পট তা আমি জানি। ইমাম (আ.) বললেনঃ ‘‘তা হোক। কিন্তু আমরা কখনও আগে রু করবো না। এমন কি তাতে আমাদের লাভ হলেও।’’

এ ছিল ইসলামের বিধান। এ সম্পর্কিয় একাধিক ঘটনা রয়েছে। এখানে সিফফিনের যুদ্ধের এক ঘটনা উল্লেখযোগ্য । কুরাইব ইবনে সাব্বাহ নামক মোয়াবিয়ার বাহিনীর একজন সৈন্য ময়দানে হাজির হয়ে আস্ফালন করে বলতে লাগলোঃ কার সাহস আছে! এসো দেখি! হযরত আলীর (আ.) বাহিনী থেকে একজন সাহসী সেনা এগিয়ে গেল। কুরাইব তাকে পরাজিত করলো ও তার লাশ এক পাশে রেখে দিয়ে আরেকজনকে আহবান করলো। হযরত আলীর (আ.) বাহিনী থেকে আরও একজন সেনা এগিয়ে গেল। কুরাইব তাকেও হত্যা করলো ও তক্ষুণি ঘোড়া থেকে নেমে এই লাশকে আগের লাশের উপরে এনে রাখলো। পুনরায় আরেকজনকে আহবান করলো এবং এভাবে পর পর চারজনকে হত্যা করে তাদের লাশগুলোকে একটির পর একটি তুলে রাখলো। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, এ ব্যাক্তির বাহু ও আঙ্গুলগুলো এতই শক্তিশালী ছিল যে, সে এক পয়সাকে হাতে নিয়ে পিষে দলা করে ফলতে পারতো। আরও বলা হয়েছে যে, কুরাইবের আস্ফালন দেখে হযরত আলীর (আ.) বাহিনীর প্রথম সারির লোকেরা পিছে সরে গিয়েছিল। এ পর্যায়ে হযরত আলী (আ.) নিজেই ময়দানে এলেন ও এক আক্রমণেই কুরাইবকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। তারপর তার লাশকে একপাশে রেখে বললেন :

আর কেউ আছে? এভাবে মুয়াবিয়া বাহিনীর চারজনকে হত্যা করে তাদের লাশগুলোকেও একের পর একটি তুল রাখলেন। তারপর কোরআনের এই আয়াত পড়লেনঃ .

(فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ)

‘‘যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অ রূপ আক্রমণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলবে।’’ (বাকারা(১৯৪ -

এবার হযরত আলী (আ.) মুয়াবিয়া বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন?

‘‘তোমরা যদি যুদ্ধ আরম্ভ না করতে তাহলে আমরাও যুদ্ধে নামতাম না। এখন যেহেতু তোমরা রুই করলে তখন আমরাও যুদ্ধ করবো।’’

ইমাম হোসাইন (আ.) এ রকম ছিলেন। তিনি আ রার দিন এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, শত্রুরাই প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করবে। তারপর তিনি আক্রমণ করার অ মতি দেবেন। এ ছিল পৌরুষত্ব - যা সাহসিকতার অনেক উর্ধ্বে ।

ত্যাগ স র্কে একটি আলোচনা

এখন আমরা আলোচনা করবো ত্যাগ সম্পর্কে। কারবালার ঘটনা ত্যাগ ও তিতিক্ষার একাধিক উদাহরণে পরিপূর্ণ। ইমাম হোসাইনের (আ.) ভাই বীরশ্রেষ্ঠ হযরত আব্বাস ত্যাগ ও তিতিক্ষার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এ সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক যুগের এক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। তবে সে ঘটনায় একজন নয় বরং কয়েক জনের তিতিক্ষার পরিচয় মেলে। জৈনক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, কোনো এক ইসলামী জিহাদে আমি আহতদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। আর একজনকে মৃত প্রায় অবস্থায় দেখলাম। (যেহেতু আহতদের দেহ থেকে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয় এ জন্যে তারা বেশি বেশি তৃ ার্ত হয়ে পড়েন।) আমি ঐ লোক কে দেখেই বুঝলাম যে তার পানির প্রয়োজন। ছুটে গিয়ে একটি পাে পানি নিয়ে এলাম। কিন্তু যখন তার মুখের কাছে পানি নিয়ে গেলাম তখন তিনি আরেক জনের দিকে ইশারা করে বললোঃ উনি আমার চেয়ে বেশী তৃ ার্ত ।তুমি বরং ওনাকে আগে পানি দাও। আমি গেলাম তার কাছে। কিন্তু তিনি আরেক জনের দিকে ইশারা করে ঐ একই কথা বললেন। এভাবে তিনজনকে রেখে যখন অন্য আরেক জনের কাছে গেলাম তখন দেখি তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। ফিরে এলাম আগের লোকের কাছে এবং দেখি তিনিও ইতোমধ্যে মারা গেছেন। ছুটে গেলাম তার আগের লোকের কাছে এবং দেখি তিনিও মারা গেছেন। এরপর যখন প্রথম লোকের কাছে গেলাম তখন দেখি তিনিও ইতোমধ্যে মারা গেছেন। মোটকথা আমি শেষ পর্যন্ত কাউকেই পানি খাওয়াতে সক্ষম হইনি। এ হলো ত্যাগ তথা উন্নত মানবাত্মার বহিঃপ্রকাশ। সূরা আদ্ - দাহরে যেমন বলা হয়েছেঃ

(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا)

‘‘নিজেরা ক্ষুধার্ত হওয়া সত্বেও ও তারা অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম এবং বন্দীদেরকে আহার্য দান করে।’’ (দাহরঃ ৯(

এ আয়াতে মা ষের ত্যাগ ও তিতিক্ষার পবি গুণটিকেই প্রশংসা করা হয়েছে, কারবালার ময়দানেও যেন এ গুণটির প্রতিফলন ঘটাতে হবে এবং এ দায়িত্ব যেন হযরত আব্বাসের উপর

আরোপিত হয়। হযরত আব্বাস ইমাম পরিবারের তৃ ার্ত শি দের জন্যে পানি আনার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে চার হাজার শত্রু- সেনার ব্যূহ প্রাচীর ভেদ করে ফোরাতের পানিতে এসে পড়লেন। তিনি ঘোড়াসহ এমনভাবে পানিতে নামলেন যে, পানি ঘোড়ার পেট ছুয়ে গেল এবং হযরত আব্বাস সহজেই ঘোড়ার পিঠে বসে মশকে পানি ভর্তি করতে পারেন। প্রথমে তিনি মশক ভরে পানি নিলেন। এবার তিনি হাত ভরে পানি তুলে মুখের কাছে আনলেন। শত্রু সেনারা দূরে থেকে তাকিয়ে দেখছিল। তারা বলে যে আমরা এটুকুই দেখলাম যে, হঠাৎ করে তিনি পানি ফেলে দিলেন এবং এককোটা পানিও পান করলেন না। দর্শকরা কেউ এর কারণ বুঝতে পারলো না। কিন্তু ইতিহাস বলেঃ

فذكر عطش الحسين

হযরত আব্বাসের তৃ ার্ত ভাইয়ের কথা মনে পড়লো। তিনি ভাবলেন, ইমাম (আ.) তাঁবুতে তৃ ার্ত থাকবেন আর আমি পানি খাব এটা কিভাবে সম্ভব?

প্রশ্ন হতে পারে, ইতিহাস এ কথা কোত্থেকে পেল? জবাব হলোঃ হযরত আব্বাস যখন পানি থেকে উঠে এলেন তিনি জোরে জোরে এক কাসিদা পড়লেন। নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করে বলছেনঃ

يـــا نفـــس مـــن بعـــد الحســـين هـــونى فبعـــــــده لا كنـــــــت ان تكـــــــونى

‘‘হে আব্বাসের নফস! আব্বাস হোসাইনের (আ.) পর আর এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে চায় না। কিন্তু তুমি পানি পান করে তৃপ্ত হতে চাও! হে আব্বাস! তোমার ভাই তৃ ার্ত আর তুমি স্বচ্ছ পানি পান করে বেঁচে থাকতে চাও? আল্লাহর শপথ করে বলছি- ভাইয়ের খেদমত, ইমাম হোসাইনের (আ.) খেদমত, সত্যের খেদমত, সেনাপতির বিশ্বস্ততা এভাবে সম্ভব নয়।’’ (দ্রঃ ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ ২১৬৫/; বিহারুল আনওয়ার ৪৫(৪১/

কারবালা ছিল সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার বাস্তব পরীক্ষা কেন্দ্র । এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ততায় ভরপুর।

উমর ইবনে কোরযা ইবনে কা'ব ছিলেন মদীনার আনসারেদর বংশের লোক। আ রার দিন যখন প্রচণ্ড তীর বর্ষণের মধ্যে ইমাম হোসাইন (আ.) মুষ্টিমেয় সঙ্গী- সাথীদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ান তখন উমর ইবনে কোরযা ঢালের মতো বুক পেতে দিয়ে নামাযের জামাতকে তীরের হাত থেকে রক্ষা করছিলেন। একটার পর একটা তীর এসে এমনভাবে তার বুকে বিধলো যে আর খালি জায়গা ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত উমর পড়ে গেলো। তার মৃত্যু আর কিছু বাকি ছিল না। এমন সময় ইমাম হোসাইন (আ.) তার শিয়রে আসলেন। উমর এত কিছুর পরও সন্দেহ করছেন যে, তিনি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পেরেছেন কিনা! তাই ইমামকে জিজ্ঞেস করলেন :

اوفيت يا ابا عبد الله

''হে ইমাম! আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি?'' কারবালা এ ধরনের ত্যাগ ও তিতিক্ষার একাধিক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

এখানে কারবালার আরেকজন শ্রেষ্ঠ বীরের ঘটনা উল্লেখযোগ্য । আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইর যখন কুফার বাইরে ছিলেন তখন নলেন যে, কী এক গণ্ডগোল হয়েছে এবং কুফাবাসীরা ইমাম হোসাইনের (আ.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্য জোগাড় করছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইর একজন মুজাহিদ ছিলেন। এ খবর নে আল্লাহ নিজে নিজে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি ইসলামের জন্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আজ রাসূলুল্লাহর (সা.) বংশধরকে রক্ষা করতে যুদ্ধে নামার মতো গৌরব অতীতের কোনো যুদ্ধেই ছিল না। এ ভেবে তিনি বাড়ীতে ফিরে আসলেন এবং তার স্ত্রীর সাথে ঘটনা খুলে বললেন। স্ত্রী বললেন, 'সাবাস! খুব ভাল কথা চিন্তা করেছ, তবে আমার এক শর্ত রয়েছে। আব্দুল্লাহ বললেন, 'কী শর্ত!' স্ত্রী বললো, 'আমাকেও সাথে করে নিয়ে যাবে।' আব্দুল্লাহ যখন স্ত্রীকে সাথে নিতে রাজী হলেন তখন তার মা এসে বললো, 'আমাকেও সাথে করে নিতে হবে।' কত বীরাঙ্গনা এ নারীরা!

আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইর মা ও স্ত্রীকে নিয়ে ইমাম হোসাইনের (আ.) কাফেলায় যোগ দিলেন। আ রার দিন অসীম সাহসিকতার সাথে আব্দুল্লাহ ময়দানে এলেন। তার মোকাবিলায় প্রথম আসলো ইবনে সা'দের গোলাম ইয়াসার। আব্দুল্লাহ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করলেন।

কিন্তু ইতোমধ্যে আরেকজন শত্রুসেনা পিছন দিক থেকে তাকে আক্রমণ করে বসলো। আব্দুল্লাহ আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত এক হাতের আব্দুলগুলো হারালেন। তারপর আরেকটি হাতে অস্ত্র নিয়ে তাকেও হত্যা করলেন। রক্ত মাখা দেহ নিয়ে একা তিনি ইমাম হোসাইনের (আ.) তাঁবুতে ফিরে এলেন। তার মাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'আমার দায়িত্ব কি ঠিকমতো পালন করিনি?' জবাবে আব্দুল্লাহর মা বললেন, 'না। আমি তোমাকে নবীর সন্তানের সাহায্য করার পথে শহীদ অবস্থায় দেখতে চাই। যতক্ষণ তুমি এ কাজ না করবে ততক্ষণ আমি তোমার উপর রাজি হবো না।

এ সময় তার স্ত্রী এলেন। অবশ্য তার স্ত্রী অল্পবয়স্কা ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু তার মা বলে উঠলেন এ সময় স্ত্রীর কথা শোনার অবকাশ নেই। আমার ভয় হয় তুমি স্ত্রীর কথা নে যুদ্ধ থেকে বিরত হও কিনা। তুমি যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে চাও তাহলে জেনে রেখো তার একটিই পথ- আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া। আব্দুল্লাহ ময়দানে ফিরে গেলেন এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। শত্রুরা তার মাথাকে ছিন্ন করে তার মা'র দিকে নিক্ষেপ করলো। আব্দুল্লাহর মা তার মাথাটিকে তুলে নিয়ে ধুলোমাটি সাফ করলেন এবং চুমু দিয়ে বললেনঃ সাবাস আল্লাহ, সাবাস! এখন আমি তোমার উপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু তারপর বললেনঃ আমরা যে জিনিস আল্লাহর পথে দান করেছি তা ফিরিয়ে নেই না। এ বলে আব্দুল্লাহর মা মাথাটিকে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। ৪৫ বিহারুল আনওয়ার)/২৮; মানাকিবে ইবনে শাহের অ ব ৪১০৪/; মাকতালুল হোসাইনঃ খারাযমী ২২২/; মাকতালুল মোকাররাম ৩১৫(

সবশেষে কারবালার উত্তপ্ত ময়দানে বিমূর্ত, ইসলামের অভিন্ন ও সমানাধিকার বিধানের এক বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করেই আমরা এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করবো। আ রার দিন যারা রাসূলের (সা.) খান্দানের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ক'জনকেই শেষ মুহূর্তে ইমাম হোসাইন (আ.) নিজে এসে ধরেছিলেন। এই ক'জনের মধ্যে দু'জন মুক্ত হওয়া গোলাম ছিল। তাদের একজন হযরত আবুজারের গোলাম ছিলেন ও পরে তিনি তার মুক্তিদান করেন। তিনি ছিলেন নিগ্রো, নাম জুন। ধারণা করা হয় যে, মুক্ত হবার পরও তিনি নবীবংশকে ছেড়ে চলে

যাননি। নবীবংশের খাদেম হিসেবে তিনি থেকে গিয়েছিলেন। আ রার দিন এই জুন ইমাম হোসাইনের (আ.) কাছে এসে বললেন, 'আমাকে যুদ্ধে যাবার অ মতি দিন।' ইমাম বললেন, 'দেখ, জুন। তুমি সারা জীবন লোকের খেদমত করলে। তোমার উচিত বাড়ীতে ফিরে গিয়ে এখন থেকে মুক্ত জীবন রু করা। তুমি এ পর্যন্ত যা করছে তাতেই আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট ।' কিন্তু জুন নাছোড়বান্দা। ইমামকে অনেক কাকুতি- মিনতি করে যুদ্ধে যেতে চাইলেন। তবুও ইমাম হোসাইন (আ.) না করলেন। কিন্তু এরপর জুন এমন এক কথা বললেন যা নে ইমাম হোসাইন (আ.) আর তাকে আটকানো জায়েজ হবে না বলে মনে করলেন। জুন বললেনঃ হে ইমাম! বুঝতে পেরেছি কেন আমাকে অ মতি দিচ্ছেন না। আমি যে কালো! আমার গা থেকে যে দুর্গন্ধ বের হয়। আমার কি শহীদ হওয়ার যোগ্যতা আছে! আমি কোথায় আর এ সৌভাগ্য কোথায়!

একথা নে ইমাম হোসাইন বললেনঃ না, তার জন্যে না। ঠিক আছে তুমি যাও। জুন অ মতি পেয়ে খুব খুশী হলেন। বীরদর্পে ময়দানে প্রবেশ করলেন। প্রাণপণ লড়াই করলেন এবং শেষ পর্যন্ত আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এবার কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) নিজেই তার কাছে ছুটে এলেন। তার মাথা কোলে তুলে নিয়ে ইমাম দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ, পরকালে তাকে সাদা চামড়ার করে দিন, তার গা থেকে গন্ধ ছড়িয়ে দিন। তাকে আবরারদের সাথে পুনরুত্থান করুন। (আবরার অর্থাৎ যারা মুত্তাকিনদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ) কুরআনে সূরা মুতাফফেফিফেনের ১৮ নং আয়াতে এসেছে :

(كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ)

''অবশ্যই পুণ্যবানদিগের (আবরার) আমলনামা ইল্লিয়িনে''।

এবার এক মর্মভেদী দৃশ্যের অবতারণা হলো। আঘাতের চোটে জুন বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। তার চোখের ওপর রক্ত জমাট বেধে ছিল। ইমাম হোসাইন (আ.) আস্তে আস্তে তার চোখের উপর থেকে রক্ত সরিয়ে দিলেন। এসময় জুনের হুশ ফিরলো। ইমাম হোসাইন (আ.)- কে দেখে তিনি

হাসলেন। ইমাম হোসাইন (আ.)ও তার মুখের উপর মুখ রাখলেন যা কেবলমা জুনের এবং হযরত আলী আকবরের ভাগ্যেই হয়েছিল।

و وضع خدَّه على خدِّه

ইমাম হোসাইন (আ.) তার মুখের উপর নিজের মুখ রাখায় জুন এতোই খুশী হলেন, যে মৃদু হাসেলন এবং ঐ হাসি মুখেই শাহাদাত বরণ করলেন।

এ ছিল কারবালায় ইসলামের একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবির অংশবিশেষ। ত্যাগ-তিতিক্ষা, সহা ভূতি, বিশ্বস্ততা, ঈমান, সাহস ও বীরত্বের অতুলনীয় ও বাস্তব নাট্যমঞ্চ।

সূচীপ ঃ

কারবালা ট্রাজেডির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ৭

ইসলামের ঊষালগ্নের প্রহেলিকাময় ঘটনাবলী এবং নবীর (সা.) উম্মতের হাতে নবীর (সা.) সন্তানের হত্যার কারণ ১০

হোসাইনী আন্দোলনের উপাদান সমূহ ২১

আন্দোলনের উপাদানগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ ৩৮

আলেম সমাজের দৃষ্টিতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ৫১

হোসাইনী বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যাবলী ৬৯

কারবালা ঘটনার দুই পিঠ ৮৪

কারবালার ঘটনা পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তব প্রতিফলন ৯৩

ত্যাগ সম্পর্কে একটি আলোচনা ১০১